অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

আসমানির চর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আসমানির চর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দেবাশীষ দেব

“রা-স্বা”

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীজিৎসুন্দর চক্রবর্তী
শ্রীজিতাদিত্য চক্রবর্তী

ইষ্টপ্রাণেষু

সূচিপত্র

অধ্যায়: ১

অধ্যায়: ২

অধ্যায়: ৩

অধ্যায়: ৪

অধ্যায়: ৫

অধ্যায়: ৬

অধ্যায়: ৭

ভুসিরাম মঙ্গলবার শেষ রাতে ধরা পড়ে গেল। পড়ারই কথা কিনা। চূড়ান্ত দুঃসাহস না থাকলে কেউ কি ভুলেও কর্নেল বীরবাহু ভঞ্জর কুঠিবাড়িতে লুটপাট করতে ঢোকে? বিশেষ করে যখন শীতের ছুটি কাটাতে জনাচারেক শিকারি বন্ধু, দুটো গ্রে হাউন্ড কুকুর, আটটা বন্দুক, দুটো পিস্তল, চারজন বিশ্বস্ত এবং অনুগত অনুচরকে নিয়ে স্বয়ং বীরবাহু কুঠিবাড়িতে বহাল রয়েছেন। আর কে না জানে যে, বীরবাহুর মতো এমন ডাকাবুকো, রাগী, মারমুখো লোক পরগনায় বিশেষ নেই! তার উপর কুঠিবাড়ি তো নয়, দুর্গ বললেই হয়। সারা বছর অন্তত পাঁচজন হাট্টাকাট্টা লোক বাড়ি পাহারা দেয়। মশা-মাছি গলবার উপায় নেই। মতিভ্রম না হলে কেউ ও-বাড়িতে ঢোকে?

হ্যাপাও তো কম নয় রে বাপু! আট ফুট উঁচু, পেরেক আর কাচ বসানো দেয়াল না হয় কষ্টে ডিঙোনো গেল, না হয় পাহারাদারদের চোখেও ধুলো দেওয়া গেল, না হয় কুকুরদেরও বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা হল, না হয় বীরবাহু আর তার বাহিনীকেও ঘোল খাওয়ানো গেল, কিন্তু তারপরেও কথা আছে বাপু। এত করার পরও তো জন্মেজয় ভঞ্জ রয়েছেন। তাঁর চোখে ধুলো দিতে পারে এমন মনিষ্যি তো এখনও জন্মায়নি। আর জন্মেজয় ভঞ্জকে পরগনার কে না চেনে? না, চেনা বলতে তেমন চেনা নয় বটে, কারণ জন্মেজয় বছরপঞ্চাশ আগেই গত হয়েছেন। কিন্তু গত হলে কী হয়, তিনি গেলে তো! যখন তখন যেখানে সেখানে ফস করে উদয় হয়ে পড়ছেন, কটমট করে রক্ত-জল-করা চাউনিতে লোককে ভিরমি খাওয়াচ্ছেন, লোকে নিশুত রাতে মাঝে-মাঝে তাঁর অট্টহাসিও নাকি শুনতে পায়।

ভুসিরাম তবু কেল্লা প্রায় মেরেই দিয়েছিল। রণপায়ে উঠে দেয়াল ডিঙোনো, ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে শিকারি কুকুরদের ঘুম পাড়ানো, দরোয়ানদের ক্যারাটের প্যাঁচ-পয়জারে কাবু করে বেঁধে ফেলা, এসব তার কাছে জলভাত। তোশাখানার দরজা অবধি পৌঁছেও গিয়েছিল সে। শুধু দরজাটা ডিঙোনোর ওয়াস্তা। তা সেটাও ভুসিরামের বাঁ হাতের খেল বই তো নয়! নামডাক তো লোকের এমনিতে হয় না। গুণ থাকলে তবেই হয়। আর একথা কে না জানে যে, ভুসিরামেরও নামডাক এমনিতে হয়নি। আশপাশের দশটা গাঁয়ের লোক ভুসিরামের নাম শুনলে যে কপালে হাত ঠেকায়, তা তো আর বিনা কারণে নয়! গোঁজেরহাটের মনসাপণ্ডিত অতি বড় শুদ্ধাচারী হয়েও একদিন বলে ফেলেছিলেন, "তস্কর হলেও ভুসিরামকে পল্লির অলংকার বলতে হয়।" দারোগা কোদণ্ড গজপতি স্বীকার করেছিলেন, "না, ভুসিরামের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।" গাঁয়ের কবি পটল পাল লিখেছেন, "ভুসিরাম, ভুসিরাম, রাম রাম ভুসি ভুসি, তুমি খাও কলা মূলা মোরা সব আঁটি চুষি। তবু বলি রাম রাম, তবু বলি ভুসি ভুসি, তোমার এলেম হেরি গোঁজেরহাট খুশি খুশি।"

তা ভুসিরাম যখন কার্যোদ্ধারের মাত্র এক পা দূরে, দরজাটা ফাঁক করাটা মাত্র বাকি, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হঠাৎ প্রায় তার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে কে যেন মোলায়েম গলায় বলে উঠল, "তুমি তো গুণী মানুষ হে!"

এসব পরিস্থিতিতে চমকাতে নেই বলে ভুসিরাম চমকাল না। তবে তার পেটের মধ্যে একটু গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছিল। বহুদিনের অভ্যেসে আর শিক্ষায় নিজেকে সে সামলাতে পারল বটে, কিন্তু লজ্জাও হল।

কেউ যে তাকে নিঃসাড়ে নজরে রেখেছে, এটা সে টের পায়নি। একটা শ্বাস ফেলে সে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, পিছনে একজন ছোটখাটো, রোগা চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে মুখটা ভাল বোঝা যাচ্ছে না বটে, তবে মনে হল মুখে একটু হাসি-হাসি ভাব।

ভুসিরাম বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বলে, "কাজের সময়ে লোককে বিরক্ত করা কি ঠিক?"

লোকটা তাড়তাড়ি জিব কেটে বলে, "তাই তো! বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে বাপু। তবে কিনা ভাল কাজকর্ম দেখলে আমি বাপু নিজেকে সামলাতে পারি না।"

ভুসিরাম বিরক্ত হয়ে বলে, "ভাল কাজের কী দেখলেন মশাই? কাজ ভাল হলে কি আপনার মতো আনাড়ির কাছে ধরা পড়ি?"

"আহা, ধরা পড়েছ বলে ধরে নিচ্ছ কেন হে? তুমি হলে জাতশিল্পী। বড়-বড় গাইয়ে, বাজিয়ে, বড়-বড় আঁকিয়ে বা লিখিয়েরা যখন কাজে মজে যান তখন তাঁদের বাহ্যজ্ঞান থাকে না বলেই শুনেছি। তবে এত মেহনত না জলে যায়!"

ভুসিরাম লোকটাকে একটা রদ্দা মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে হাতের কাজটা সেরে নেবে বলে তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু একথাটা শুনে থমকাল। বিনয়ের সঙ্গেই বলল, "তার মানে?"

"তার মানে বুঝলে না? যে জিনিস খুঁজছ, তা তোশাখানায় নেই।"

তোশাখানায় কী আছে তা ভুসিরামও জানে না। তবে দামি জিনিসই থাকার কথা। কিন্তু লোকটা কোন জিনিসের কথা কইছে, তা আন্দাজ করার জন্য সে একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলে, "নেই? তা হলে সেটা গেল কোথায়?"

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "ও বস্তু হাতে পেলে যে সাত পুরুষ ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে বসে খাওয়া যাবে এ কে না জানে! তাই জিনিসটা সরিয়ে কানাকুঠুরিতে পাচার করা হয়েছে বলে কানাঘুষো শুনছি। আমি অবিশ্যি কানাকুঠুরির হদিশ জানি না। তুমি জানো নাকি বাপু? তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই যে, আমি ভঞ্জবাবুর বন্ধু সেজে এসেছি বটে, কিন্তু আমিও জিনিসটার জন্য তক্কে-তক্কে আছি।"

ভুসিরাম বড্ড ধন্দে পড়ে গেল। একটু দোনোমনো ভাব এল তার। বলল, "কানাকুঠুরি তো অন্দরমহলের ভাঁড়ারঘরের নীচে।"

লোকটা ভারী খুশি হয়ে বলে, "বাহ! এই তো গুণী মানুষের রাজলক্ষণ। তবে আর দেরি কেন বাপু, কার্যোদ্ধারে নেমে পড়লেই তো হয়! আমার কাছে খবর আছে, ও জিনিসের খোঁজে আরও কেউ-কেউ ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছে।"

ভুসিরাম গম্ভীর হয়ে বলল, "কিন্তু হাতের কাজ ফেলে অন্য কিছুতে হাত দেওয়া আমি পছন্দ করি না।"

"আহা, সে তো ঠিক কথাই হে! তা হলে তুমি বরং কাজটা সেরেই নাও। তোশাখানায় এখনও যা খুদকুঁড়ো পড়ে আছে, তা কুড়িয়েবাড়িয়ে বড় মন্দ হবে না। একটু হিসেব করে চললে ওতেও জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আসল জিনিসটা সরিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু দু'-চারখানা মোহরটোহর অবশ্য এখনও পড়ে আছে। ও নিয়ে অবশ্য কর্তার মাথাব্যথা নেই। মনে হয়, ছিঁচকে চোরদের জন্যই মায়া করে ফেলে রেখেছেন।"

কথাটা খুব প্রেস্টিজে লাগল ভুসিরামের। সে হিসহিস করে রাগের গলায় বলল, "কে ছিঁচকে চোর?"

"আহা, কথাটা গায়ে মেখো না বাপু। তোমাকে বলা নয়। কর্তার খাস কাজের লোক গয়ারামের কাছেই শুনেছি, তোশাখানার দেয়ালে নোনা ধরেছে, সারানোর জন্য মিস্তিরি লাগানো হবে। তাই রোজই সব দামি জিনিস সরিয়ে ফেলা হচ্ছে কিনা।"

ভুসিরাম একটু ভড়কে গেল, কথাটা সত্যি হলে তো তার এক গাল মাছি! সে বলল, "আপনি এত কথা জানলেন কী করে? আপনি কে?"

লোকটা ভারী আহ্লাদের হাসি হেসে বলে, "তেমন কেউকেটা কেউ নই রে বাপু, পিতৃদত্ত নাম হল রাখোহরি প্রামাণিক। একটু-আধটু বন্দুকটন্দুক চালাতে পারি বলে কর্তা বীরবাহু বড্ড স্নেহ করেন। সেই সুবাদেই যাতায়াত। তা বলে ভেবে বোসো না যে, আমি তোমার শত্তুর।"

ভুসিরাম মৃদু হেসে বলে, "তা ভাবলে কি এতক্ষণ আপনি দু'পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন?"

"সে কথা সত্যি। তুমি আহাম্মক হলে এতক্ষণে রদ্দা খেয়ে আমার চিৎপটাং হওয়ার কথা। আনাড়িদের সঙ্গে কাজ করে সুখ নেই। এই তোমার মতো বুঝদার পেলে কাজ করে আনন্দ আছে। তা হলে বরং তুমি হাতের কাজটা চটপট সেরে ফেলো, তারপর না হয় বড় কাজে হাত দেওয়া যাবে! ততক্ষণে অবশ্য ভোর না হয়ে যায়!"

ভুসিরামের লোকটাকে মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না, বিশ্বাস হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু মনটার মধ্যে একটা দোনোমনোও হচ্ছে। তোশাখানার দরজা খসাতে আরও খানিকক্ষণ গা ঘামাতে হবে। এত পরিশ্রম যদি বৃথা যায়! সে বলল,"আপনার খবর পাকা তো?"

রাখোহরি মাখো-মাখো গলায় বলল, "তোমার কি ধারণা যে, এই নিশুত রাতে আমি তোমার উপকার করব বলে ঘুরঘুর করছি? নিজের ধান্দা না থাকলে কেউ একটা চোরকে তেল দেয়? আমি বন্দুকে পাকা বটে, কিন্তু দরজা খসানোর বিদ্যে জানা নেই। তাই ভাবছিলাম, যদি তেমন গুণী কাউকে পাওয়া যায়। ভগবানের আশীর্বাদই হবে, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এখন তোমার ইচ্ছে।"

ভুসিরাম অবশ্য ঠান্ডা গলায় বলে রাখল, "দেখবেন, কোনও গড়বড় হলে কিন্তু মুশকিল আছে।"

রাখোহরি আহ্লাদের গলাতেই বলল, "তা আর বলতে!"

'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা জানা থাকলেও নিয়তির ফেরে মানুষ কার্যকালে বিস্মরণ হবেই কি হবে। ভুসিরামের ঘাড়েও লোভের ভূতটা সওয়ার হল। আর সে একটা অজ্ঞাতকুলশীল, উটকো লোকের পিছু-পিছু, যেন ঘোরের মধ্যে গিয়ে ভাঁড়ারঘরে সেঁধোবার পরই বুঝতে পারল বড্ড আহাম্মকি করে ফেলেছে। ঘরের নিরেট অন্ধকারে পা দিয়ে একটু চোখ সইয়ে নিতে যেতেই লোকটা ""এই যে, এদিকে..."" বলে তার হাত ধরে এমন একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে, ভুসিরাম সামলাতে না পেরে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই টের পেল কেউ বাইরে থেকে টেনে দরজা বন্ধ করে হুড়কো টেনে দিল। ভুসিরাম অভিজ্ঞ লোক। কখন ফাঁদে পড়েছে তা বুঝতে পারে। এখনও পারল। ভাঁড়ারঘরের দরজা পুরু শাল কাঠের, তাতে লোহার পাত বসানো। বাইরে মজবুত হ্যাসবোল্ট। তবু দরজাটা খোলার একটা চেষ্টা করা যেত, কিন্তু উপুড় হয়ে পড়ার সময় তার যন্ত্রপাতির থলিটা হাত থেকে খসে গিয়েছিল, সেটা এখন হাওয়া হয়েছে। রাখোহরি যে-ই হোক, সে যে পাকা লোক তাতে সন্দেহ নেই।

তখনও ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। বীরবাহুর পেল্লায় চেহারার স্যাঙাৎরা এসে দোর খুলে তাকে নারকোলের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে কর্তার সামনে যখন দাঁড় করাল, তখন লজ্জায় সে অধোবদন। এরকম কাঁচা একটা চালে জব্দ হওয়ার মতো খাটো বুদ্ধির লোক তো সে নয়! তবে কি তার বিনাশকাল এসে গেল! বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ বলে কী একটা কথা আছে না!

কে যেন বলে উঠল, "আছে।"

ভারী অবাক হয়ে ভুসিরাম কথাটা কে বলল তা বুঝবার চেষ্টা করছিল। থতমত ভাবটা কেটে যাওয়ার পর বুঝতে পারল কথাটা তার উদ্দেশে বলা নয়, উপেনবাবুর পেটের গণ্ডগোল বলে সকালে দইচিঁড়ে খাবেন, তাই গয়ারামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাড়িতে দই আছে কি না। জবাবে গয়ারাম বলল, "আছে।"

সিংহাসনের মতো পেল্লায় একটা চেয়ারে বিরুবাবু বসা, চেয়ারের সর্বাঙ্গে কারুকাজ। বিরুবাবুর দু'পাশে আরও দুটো করে চেয়ারে তাঁর চার শিকারি বন্ধু বসে আছেন। শুঁটকো উপেন হাজরা, গাট্টাগোট্টা খগেন মাল, গম্বুজের মতো লম্বা, সিড়িঙ্গে গিরিধারী মাঝি আর বেঁটে ও গুঁফো বলাই জানা। সবাই কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। থাকারই কথা। মাপজোখ করে নিচ্ছেন আর কী। সবারই হাতে গরম চায়ের কাপ। দামি চায়ের সুবাস ভারী ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কথা কে শুরু করবেন তা বুঝতে পারছিল না ভুসিরাম। ধীরেসুস্থে চা শেষ করে একে-একে সকলেই সামনের বেঁটে টেবিলটার উপর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন।

বিরুবাবুর চেহারাখানা যেমন দশাসই, তাঁর গলার আওয়াজেও তেমন কামানের গর্জন। গেলাসের জলে আচমনটা সেরে নিয়ে ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে তিনি কামানটা দাগলেন, "তোর কিছু বলার আছে?"

ভুসিরাম নতমস্তকেই বলল, "আছে বিরুবাবু।"

"বলে ফ্যাল।"

"আমাকে গুলি করে মেরে দিন।"

উপেন হাজরা হঠাৎ আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "বলিস কী! গুলি! গুলির দাম কোথায় ঠেলে উঠেছে জানিস! আস্পা কম নয় তো তোর! কোথাকার নবাবপুত্তুর এলি তুই যে, গুলি খেয়ে মরার শখ!"

ভুসিরাম একটু থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে বলল, "তা হলে বরং ফাঁসিই দিন। সেই ভাল।"

হঠাৎ খগেন মাল হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, "কেন রে, তুই কি ক্ষুদিরাম না ভগৎ সিংহ যে ফাঁসিতে ঝুলতে চাস? ব্যাটার দেখছি শহিদ হওয়ার মতলব!"

গিরিধারী মাঝি একটা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "ফাঁসির হাঙ্গামার কথাটাও ভাবুন। গাছে ওঠো রে, দড়ি টাঙাও রে, ফাঁস বাঁধো রে, দড়ি টানাটানি করো রে। সক্কালবেলায় এত হুড়যুদ্ধু করা কি পোষায় মশাই! আমরা এত মেহনত করব আর তুই দিব্যি আরাম করে ফাঁসিতে ঝুলে দোল খাবি, এ কি ছেলের হাতের মোয়া?"

বিরুবাবু তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করতে করতে ফের কামান দাগলেন, "তোর নাম কী?"

ভুসিরাম ধরা গলায় বলে, "আজ্ঞে, ভুসিরাম।"

গুঁফো বলাইবাবু বরাবর কানে একটু খাটো। ডুকরে উঠে বললেন, "আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ভুসিমাল একটা নাম হল? কে রেখেছে তোর এ নাম বল তো!"

"আজ্ঞে ভুসিমাল নয়, ভুসিরাম। আমার বাবা ছিলেন ঘাসিরাম, আমি ভুসিরাম।"

বলাইবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "তবে তুই সার্থকনামা। ভুসিমালই বটে! কোন আক্কেলে ধরা পড়ে এই সক্কালবেলাটা আমাদের মাটি করলি বল তো! চুরি করেছিস ঠিক আছে, তারপর ভদ্রলোকের মতো সরে পড়বি তো! দাঁত কেলিয়ে কোন লজ্জায় সুমুখে দাঁড়িয়ে আছিস রে বেহায়া! আজ সকালে আমাদের ময়নাডাঙার জলায় পাখি শিকার করতে যাওয়ার কথা। তোর জন্য সব ভেস্তে গেল। ভুসিমালই বটে রে তুই!"

একবুক অভিমানের সঙ্গে ভুসিরাম বলল, "আমাকে বরং এক বাটি বিষ দিন, এ অপমান আর সহ্য হয় না।"

উপেনবাবু বিদ্রুপের গলায় বললেন, "ব্যাটা যেন সক্রেটিস এলেন। তার জন্য এখন বিষ আনতে বাজারে ছোটো! তারপর যত্ন করে জামাইআদরে বিষ বেড়ে দাও! সঙ্গে আচার,পাঁপড়ভাজা?"

গিরিধারীবাবু বললেন, "আর বাটিটার কথাও ভাবুন, যে বাটি করে বিষ বেড়ে দেওয়া হবে সেই বাটিটা কি আর ব্যবহার করা চলবে? ভুল করে যদি সেই বাটিতেই কাউকে মাংস বা পায়েস বেড়ে দেওয়া হয় তা হলে তো সর্বনাশ!"

খগেনবাবুও সায় দিয়ে বললেন, "অবশ্যই। বিষ ডেনজারাস জিনিস মশাই। জেনেশুনে বিষ পান করতে স্বয়ং রবি ঠাকুর নিষেধ করে গিয়েছেন।"

ভুসিরাম কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "কর্তাবাবু, মারুন, কাটুন, যা হয় কিছু করুন। আমার বড্ড জ্বলুনি হচ্ছে।"

গুঁফো বলাই বাঘা গলায় ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ ! তুই আমাদের হুকুম করার কে রে! মারব না কাটব, সেটা আমরা ঠিক করব। তুই বলার কে? মারতে-কাটতে মেহনত হয় না বুঝি! ওসব কি মাগনা হয়?"

ফাঁপরে পড়ে ভুসিরাম হাতজোড় করে বলে, "তা হলে আমার বাঁধনটা খুলে দিন আজ্ঞে, আমি আজ গলায় দড়ি দেব বলে নিজেই ঠিক করে রেখেছি।"

খগেন মাল ফুঁসে উঠে বললেন, "কোন আইনে? গলায় দড়ি দিলেই তো হবে না, তারও তো নিয়মকানুন আছে রে বাপু। ফস করে গলায় দড়ি দিলেই হল? পেনাল কোড ঘেঁটে দেখিস, গলায় দড়ি দিলে দশটি বছর ঘানি টানতে হবে।"

বিরুবাবু এতক্ষণ ভ্রূকুটিকুটিল চোখে চেয়ে ছিলেন, এবার হঠাৎ কামানের আওয়াজ ছাড়লেন, "গয়ারাম, এর বাঁধন খুলে দে।"

গয়ারাম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভুসিরামের বাঁধন খুলে দিল।

বিরুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মালপত্র কিছু কি সরাতে পেরেছিল রে গয়ারাম?"

"আজ্ঞে না, কর্তা।"

বিরুবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, "তা হলে সারারাত বাড়ির মধ্যে ঢুকে করছিল কী? হাডুডু খেলছিল নাকি?"

"আজ্ঞে না কর্তা, ভাঁড়ারঘরে আটকা পড়ে কান্নাকাটি করছিল।"

"অপদার্থ আর কাকে বলে! ঠিক আছে, কান ধরে দশবার ওঠবোস করিয়ে ছেড়ে দে।"

চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে,অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, কৃতকর্মের জন্য হা-হুতাশ করতে করতে ভুসিরাম নিজের কান ধরে দশবার ওঠবোস করল।

বিরুবাবু হাতের একটা তাচ্ছিল্যসূচক নাড়া দিয়ে গোরু তাড়ানোর গলায় বললেন, "যা, যা, বিদেয় হ।"

কোমরের গামছাখানা খুলে চোখ মুছতে মুছতে ভুসিরাম কুঠিবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সে স্পষ্ট দেখছিল, দুনিয়ার সব রং উবে গিয়ে চারদিকটা সাদা-কালো হয়ে গিয়েছে। ঘাস কালো, গাছ কালো, আকাশ সাদা। তার লাল গামছাখানা অবধি কালচে মেরে গিয়েছে। রং দিয়ে অবিশ্যি ভুসিরামের আর কোনও প্রয়োজনও নেই। সে যে এক রাত্রিতে বাঘ থেকে বেড়ালে নেমে এসেছে তা বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে না। এই গতকালও তাকে দেখলে গোঁজেরহাটের লোকেরা পথ ছেড়ে দিয়েছে, হেঁ হেঁ করে দেঁতো হাসি হেসে হাত কচলাতে কচলাতে কুশল প্রশ্ন করেছে, সে কারও দিকে চেয়ে একটু হাসলে সে ধন্য হয়ে গিয়েছে, ধোপা নাপিত কখনও পয়সা নেয়নি, দোকানিরা আদ্দেক দাম নিয়েছে। ভেবে চোখে বড্ড জল আসছে তার, সেই জলে গামছাখানা সপসপ করছে ভিজে।

বিরুবাবু তাকে ক্ষমা করলেও সে নিজেকে ক্ষমা করে কী করে!

সে সোজা গিয়ে হরিপদর দোকান থেকে এক গোছ পাটের দড়ি কিনে ফেলল। হরিপদ আহ্লাদের গলায় বলল, "দড়ির দরকার পড়ল কেন হে! বলি গোরু কিনেছ নাকি?"

জবাব দেওয়ার মতো মনের অবস্থা নয়, তাই ভুসিরাম শুধু বলল, "হুঁ।"

হরিপদ বলল, "গোরু কেনা খুব ভাল। বাড়িতে লক্ষ্মীশ্রী আসে। তোমার উন্নতি দেখে আমরা তো সবাই বলাবলি করি, ভুসিরাম গোরু তো গোরু, একদিন হাতি কিনে ফেলবে। চারদিকে এখন তো শুধু তোমারই জয়জয়কার ভায়া! এক সময়ে মদনগুন্ডা কিছু নাম করেছিল বটে, তারপর তপন মস্তানও কিছুদিন তড়পেছিল, দূর দূর, তোমার কাছে ওরা তো নস্যি!"

ঘোর অন্যমনস্কতার মধ্যেই সে বলল, "হুঁ।" তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এই হরিপদই আগামীকাল কী নজরে দেখবে তাকে? হয়তো ভুসিরামের দিকে তাকিয়ে তাকে একটা শুঁয়োপোকা বলেই মনে হবে হরিপদর। কিংবা কেন্নো অথবা মশা মাছি বা আরশোলা।

হরিপদ দাম নিতে চাইছিল না, কিন্তু ঋণ রেখে মরার ইচ্ছে নেই বলে সে জোর করেই দাম গছিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

হাতে গলিয়ে দড়ির গোছাটা কাঁধে ফেলে ভুসিরাম গোবিন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে হাজির হয়ে গেল। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। খালি পেটে মরাটা ঠিক হবে বলে তার মনে হল না।

গাঁয়ে এখনও তার খুব খাতির, কারণ এখনও খবরটা জানাজানি হয়নি। তবে তারও তো বিশেষ দেরি নেই। গাঁয়ে এসব খবর রটতে মোটেই দেরি হয় না। মিঠাইয়ের দোকানের মালিক জয়লালও তাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে একখানা চেয়ার ঝেড়েঝুড়ে বসতে দিল। গদগদ গলায় বলল, "আজ বড্ড সরেস মন্ডা আছে, খানকতক চলুক, ততক্ষণে কচুরি আর আলুর তরকারি নেমে যাবে। গরম নিখুঁতিও আছে ভায়া, তারপর তোমার পছন্দের ছানার পায়েস তো রয়েইছে।"

ভুসিরাম একটা বড় শ্বাস ফেলল। কথায় বলে ফাঁসির খাওয়া। তা আজ না হয় ফাঁসির খাওয়াই খাবে সে। এর পর তো আর খাওয়াদাওয়ার বালাই-ই থাকছে না। যদি বেঁচেও থাকে তা হলে এই জয়লালই তাকে

দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেবে আগামীকাল। হয়তো আঁশটে মুখে বলবে, 'এখানে সুবিধে হবে না বাপু,অন্য জায়গায় দ্যাখো।' কিংবা অনিচ্ছের সঙ্গে ন্যাতানো কচুরি আর ঠান্ডা জিলিপি এগিয়ে দেবে।

নাহ, বেঁচে থাকার আর কোনও অর্থই নেই।

জয়লাল বলল, "তা ভুসিভায়া, কাঁধে দড়ির গোছ দেখছি যে! বলি বাঁধাছাঁদার ব্যাপার আছে নাকি? বিছানা বেঁধে তীর্থদর্শনে যাচ্ছ না তো! নাকি কাউকে গাছে বেঁধে কচুয়াধোলাই দেবে!"

ভুসিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হুঁ।"

খেতে গিয়ে সে টের পেল, কী খাচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। রবারের মতো কী একটা জিনিস চিবোচ্ছে সে, পেটেও যাচ্ছে বটে, কিন্তু ঠিক কী খাচ্ছে সেটা ঠাহর হচ্ছে না। না হোক, তাতে আর কী যায় আসে! খেতে হয় বলেই খাওয়া। তবে দুঃখ এই যে, তার এই শেষ খাওয়াটা তেমন জমল না।

পকেটে হাত দিতেই হাঁ হাঁ করে উঠল জয়লাল, "করো কী, করো কী হে ভুসিদাদা! তোমার কাছে পয়সা নিলে যে পাপ হয়ে যাবে!"

ভুসিরাম ছলছলে চোখে চেয়ে থেকে বলল, "আজ আমার মুখ চেয়ে পাপটা হজম করে নাও ভাই।"

বলে জয়লালের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

গোঁজেরহাটের জাগ্রত কালী হলেন ভৈরবেশ্বরী কালী। দেড়শো বছরের পুরনো মন্দিরে নিয়মিত পুজো হয়। যোগেযাগে ভিড়ও হয় খুব। পঁচাশি বছর বয়সি পুরুত অনঙ্গমোহন ভুসিরামকে দেখেই আঁতকে উঠে বললেন, "বাবা ভুসিরাম, খবরটবর সব ভাল তো! তা এই সক্কালবেলায় মন্দিরে কেন বাবা? বাড়িতে কি বেস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো আছে? তা কষ্ট করে নিজে আসবার দরকার কী ছিল, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত!"

ভুসিরাম ঠাকুরমশাইয়ের কথার জবাব না দিয়ে আগে ভূমিষ্ঠ হয়ে মা কালীকে একটা পেন্নাম ঠুকল। পাপতাপ বিস্তর করা আছে। মরলে অধোগতিই হওয়ার কথা। তারপর মাথা তোলা দিয়ে বলল, "ঠাকুরমশাই, আজ দিনটা কেমন তা পাঁজি দেখে একটু বলুন তো।"

"পাঁজি দেখার দরকার নেই, আজ শুক্লা চতুর্দশী, দিন বড় ভাল বাবা। আজ কি কোনও শুভ কাজে বেরিয়েছ নাকি? তা আজ সর্বকর্মের পক্ষেই প্রশস্ত। পরস্ব অপহরণ হোক বা দ্রব্যাদি অপসারণ হোক সব কাজেই সিদ্ধি।"

ভুসিরাম থমথমে মুখে বলে, "ওসব নয় ঠাকুরমশাই, মৃতে দোষ আছে কি না সেইটে দেখে দিন।"

অনঙ্গমোহনের চোয়ালটা হঠাৎ ঝুলে পড়ল। কাঁপা হাতে পাঁজিখানা নিয়ে একটু উলটে দেখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, "মৃতে ত্রিপাদ দোষ হয় বলে মনে হচ্ছে।"

"সেটা কি খুব খারাপ জিনিস?"

অনঙ্গমোহন আমতা-আমতা করতে লাগলেন, জুতসই জবাবটা ভেবে পাচ্ছেন না।

অধৈর্য হয়ে ভুসিরাম বলল, "কিছু মূল্য ধরে দিলে মৃতে দোষ নাস্তি করা যাবে কি না সেইটে দেখুন।"

অনঙ্গমোহন ভারী উদার গলায় বললেন, "তা যাবে না কেন? খুব যাবে।"

ভুসিরাম ট্যাঁক থেকে একান্ন টাকা বের করে প্রণামীর থালায় রেখে বলল, "মন্তরটা একটু খেলিয়ে উচ্চারণ করবেন ঠাকুরমশাই, কাজ যেন হয়।"

অনঙ্গমোহন ঘাড় কাত করে বললেন, "খুব হবে বাবা, খুব হবে। মৃতে অমৃতযোগ করে দেব'খন।"

"তাই দেবেন।" বলে ভুসিরাম উঠে পড়ল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ঘটনাটা চাউর হওয়ার আগেই ঝুলে পড়া ভাল। গোঁজেরহাটের যেসব মানুষ আজও তাকে এত খাতির করে তারাই আর কিছুক্ষণ পরে তাকে হয়তো বক দেখাবে, টিটকিরি দেবে, চাই কি সিটিও মারতে পারে। এর পর হয়তো তাকে বিদ্রুপ করে পটল পাল কবিতা লিখবে, গুণেন বাউল গান বাঁধবে, মনসাপণ্ডিত 'কুলাঙ্গার, পল্লির কলঙ্ক' বলে গালাগাল করবেন, দারোগা কোদণ্ড গজপতি হয়তো বলবেন, "ভুসিরাম যে এমন গোমুখ্যু, তা তো এতদিন বুঝতে পারিনি।" মনশ্চক্ষে এবং মনঃকর্ণে সে তার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছিল।

গোঁজেরহাটের উত্তরে মাইলটাক হাঁটলেই কুমিরমারির জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতরে কেতুগড়ের ভাঙা রাজবাড়ি।

রাজবাড়ির পশ্চিমে জলার ধার ঘেঁষে খুব জুতমতো একটা বট গাছ আছে। চারদিকে বটের ঝুরি নেমে দিব্যি আড়াল হয়ে আছে ভিতরটা। ওই বটবৃক্ষে ফাঁসি লটকালে কাকপক্ষীও টের পাবে না। এমনিতেই জনশূন্য জায়গা, তার উপর ভূতের আস্তানা বলে বদনাম আছে। আর কিছুক্ষণ পর সেও অবশ্য তাদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলবে। এইসব ভাবতে ভাবতে জোর কদমে হাঁটা ধরল ভুসিরাম। পনেরো মিনিটের রাস্তা বারো মিনিটে পেরিয়ে গেল সে। জঙ্গলের ভিতরে বেশ ঘোলাটে অন্ধকার, দিনমান বলে বোঝা যায় না।

বেশ অনেকটা ভিতরে ঢোকার পর ভাঙা রাজবাড়িটা দেখা গেল। রাজবাড়ি বলে আর চেনার উপায় নেই। আগাছায় প্রায় সবটাই ডুবে আছে। শুধু দরবারের আধভাঙা গম্বুজটা এখনও জেগে রয়েছে। ভুসিরাম বট গাছের নীচে ঘাসের উপর বসে একটু জিরিয়ে নিল। এখন আর তেমন তাড়া নেই। সামনেই পরলোক। ঝুলে পড়লেই হয়। শেষ সময়টা ধীরেসুস্থে কাটানোই ভাল।

জিরোনোর পর সে সাবধানে বট গাছের একটা নিচু ডাল ধরে উপরে উঠল। খুব বেশি উপরে ওঠার দরকারও নেই। নীচের দিকে একটা সুবিধেমতো ডাল পেয়ে দড়ির একটা মুড়ো তাতে বেঁধে ফেলল কটকটে করে। অন্য মুড়োটায় গোল করে ফাঁস তৈরি করতেও বেশি গা ঘামাতে হল না। খুব মন দিয়ে কাজ করছিল বলে চারদিকটা তেমন খেয়াল করেনি। হঠাৎ আশপাশ থেকেই কে যেন ভারী মিঠে আর মোলায়েম গলায় বলে উঠল, "ভায়া কি চললে নাকি?"

না, ভুসিরাম চমকাল না, তবে লোকটার নির্লজ্জ বেয়াদপি দেখে সে তাজ্জব! ভুসিরাম গাছের উপর থেকেই বলল, "রাখোহরিবাবু, আপনার কিন্তু লজ্জা হওয়া উচিত।"

রাখোহরি ভারী অপ্রস্তুত ভাব করে তেমনি মিঠে গলাতেই বলল, "লজ্জা হচ্ছেও। খুবই লজ্জা হচ্ছে হে! কিন্তু দড়িটা কি ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে?"

"কেন বলুন তো! কোনও ভুল হয়েছে?"

"আমার তো নীচে থেকে দেখে মনে হচ্ছে গেরোটা ঠিকমতো এঁটে বসেনি। ও হল ফসকা গেরো। তুমি ঝুলে পড়লে দড়ির গিঁটও আলগা হয়ে খুলে পড়বে!"

"বটে! দড়ি সম্পর্কে আপনি কী জানেন মশাই?"

"আহা, আমার যে দড়িরই কারবার। আমার কারখানার দড়ি যে সারা দেশে চালান যায়! আমি জানব না তো কে জানবে? আরও একটা কথা আছে বাপু।"

"কী কথা?"

"ফাঁসি দিতে হলে কেউ কি এই গাছ বাছে? দেখছ না গায়ে-গায়ে বটের ঝুরি নেমেছে। বডি যে ঝুল খাবে তার তো ফাঁকই নেই! শেষে মাঝপথে বডি আটকে ত্রিশঙ্কু অবস্থা না হয়! তোমার ভালর জন্যই বলছি।"

"আমার ভাল ভেবে আপনার আর কাজ নেই। আপনি এখন বিদেয় হন তো! আমার হাতে এখন গুরুতর কাজ রয়েছে দেখছেন না!"

"আহা আমি তো কাজের কথাই বলছি। সুষ্ঠুভাবে কাজটা যাতে সমাধা হয় সেই উদ্দেশ্যেই বলা। এই জন্যই লোকের ভাল করতে নেই।"

"কথাটা বলতে আপনার লজ্জা করল না! আপনি কি লোকের ভাল করার মতো মানুষ? আজ সকালের কথা কি বিস্মরণ হয়ে গিয়েছে? আপনার বিস্মরণ হলেও আমি কিন্তু ভুলছি না। সারাজীবন মনে রাখব যে, আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন!"

"আহা তোমার সারা জীবন আর কতক্ষণ! তুমি পটল প্লাক করলে তো আর মনে রাখারাখির ঝঞ্ঝাটও থাকছে না কিনা।"

ভুসিরামকে কথাটা স্বীকার করতে হল। বলল, "তা বটে!"

"তাই বলছিলাম, আটঘাট বেঁধে কাজ করা ভাল।"

"দেখুন মশাই, এই অন্তিম সময়টা সকলের কাছেই খুব গুরুতর। এই সময়টায় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়, মনটাও ফুরফুরে রাখা দরকার, ঠাকুর দেবতার নামও তো খানিক স্মরণ করতে হবে নাকি বলুন। তা এই গুরুতর একটা ব্যাপারের মাঝখানে আপনি হঠাৎ উদয় হয়ে ভ্যাজরভ্যাজর করে যাচ্ছেন কেন বলুন তো! এতে মনটা চটকে যায় কি না ভেবে দেখুন।"

রাখোহরিকে স্বীকার করতে হল যে এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। আরও বলল, "এই জঙ্গলে নাকি ফাঁসিতে লটকানোর জন্যই একটা আলাদা গাছ আছে।"

ভুসিরাম বলল, "আপনার পছন্দ করা গাছে আমি ফাঁসিতে লটকাতে যাব কেন মশাই? আমার কি মান সম্মান নেই নাকি!"

রাখোহরি বলে, "তা থাকবে না কেন? তবে কিনা সেটা পারিজাত গাছ। তাতে লটকালে সাক্ষাৎ স্বর্গবাস। আর সত্যি কথা বলতে কী বাপু, তোমার কাজকর্ম আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। লোকমুখে শুনছি বটে যে, তুমি একজন কেউকেটা লোক, কিন্তু সেই প্রাতঃকাল থেকে দেখে যাচ্ছি, তুমি একটার পর একটা কাঁচা কাজ করে যাচ্ছ! এমনকী এতক্ষণের চেষ্টায় ঠিকমতো ফাঁসিতেও লটকাতে পারলে না! পাকা লোক হলে কখন ফাঁসিতে লটকে এতক্ষণে বাড়ি গিয়ে পান্তা খেতে বসে পড়ত!"

"দেখুন মশাই, মানুষের অভিজ্ঞতা হতে সময় লাগে। আমি তো আর রোজ রোজ গলায় দড়ি দিয়ে বেড়াই না! এইটেই আমার প্রথম ফাঁসি। ভুলচুক তো হতেই পারে! তা নিয়ে এত কথা কীসের মশাই?"

রাখোহরি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলে, "দুঃখ কখন হয় জানো? যখন একজন সত্যিকারের গুণী মানুষকে কাঁচা ভুল করতে দেখি। এই তোমার কথাই ধরো। মাঝরাতে রণপায়ে চড়ে দেওয়াল ডিঙোনো থেকে

গোটা অপারেশনটাই আমি নিজের চোখে দেখেছি বলেই বলছি, একদম নিখুঁত। যেন উঁচুদরের এক শিল্পীর কাজ। যেন কেউ পাকা হাতে স্কেচ এঁকে যাচ্ছে। কাঁচা ভুলটা করলে আমাকে বিশ্বাস করে আহাম্মকের মতো কানাকুঠুরিতে ঢুকে। তারপর তোমার যে হেনস্থাটা হল, তাও নিজের চোখেই দেখা। হাতি পাঁকে পড়লে দুঃখ হয় কি না বলো!"

ভুসিরামের বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধরা গলায় বলল, "তা তো বটেই! তবে এসব ভেবে আর লাভ কী বলুন। আমি তো রওনা হয়েই পড়েছি!"

"আহা, রওনা হতে বারণ করছে কে? আরামসে রওনা হয়ে পড়ো। কিন্তু ফের একটা কাঁচা ভুল করতে যাচ্ছ বলেই বলছি। গুণী মানুষ যখন মরে তখন মরার ভিতরেও নিজের ছাপ রেখে যায়। আর পাঁচটা এলেবেলে লোকের মতো দাঁত ছরকুটে, আখাম্বা আহাম্মকের মরার মতো মরলে কি ভাল দেখাবে বাপু? এই যে তুমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে যাচ্ছ এর মধ্যে আর্ট কোথায়? সিগনেচার কোথায়? শিল্প কোথায়? মরবার পর যদি লোকে শতমুখে না বলে যে, 'হ্যাঁ, ভুসিরাম একটা মরার মতো মরেছে, বাপের ব্যাটার মতো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে,' তা হলে আর কী হল?"

ভুসিরামের লোকটাকে একদম বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে একটা কী যেন আছে! একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। সে দোনোমনো ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ গাছের উপর বসে রইল। একটু ভাবল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে এল নীচে। গামছায় মুখের ঘাম মুছে ঘাসের উপর রাখোহরির পাশটিতে বসে বলল, "আপনার মতলবটা কী তা একটু বলবেন?"

"মতলব একটা ছিল বটে, কিন্তু তোমাকে বলে লাভ কী বলো তো! একটু বাদেই তো তুমি পটল তুলবে, মরুনে মানুষকে দিয়ে কি কোনও কাজ হয়?"

ভুসিরাম মাথা নাড়া দিয়ে বলল, "তা বটে।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর রাখোহরি হঠাৎ তার মধুমাখানো গলায় বলল, "তোমার গড়িমসি দেখে মনে হচ্ছে, এবেলায় আর গলায় দড়ি দেওয়ার ইচ্ছে নেই!"

ভুসিরাম একটু গরম হয়ে বলল, "আমার মরা নিয়ে আপনার এত গরজ কীসের?"

"না, এই ভাবছিলুম কর্তাবাবুকে গিয়ে এখন কী বলি! তিনি যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন, তারই বা কী হবে!"

"কর্তাবাবুটি আবার কে?"

"চিনলে না? কর্নেল বীরবাহু হে! আজ সকালে যিনি তোমাকে একেবারে ল্যাজেগোবরে করে ছেড়েছেন।"

ভুসিরাম একটু গরম হয়ে বলে, "তাঁর খবরে আমার কী কাজ মশাই?"

"আহা, তিনি যে তোমার জন্যই বসে আছেন হে!"

ভুসিরাম চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠে বলল, "কেন, জুতোপেটা করা আর নাকে খৎ দেওয়ানোটা বাকি রয়ে গিয়েছে বুঝি!"

"দূর-দূর, ওসব নয়। খারাপটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন?"

"তাঁর সঙ্গে ইহজন্মে আমার আর দেখা হবে না। বুঝলেন? জীবনে এত অপমান হইনি মশাই। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়!"

রাখোহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তা হলে আসল কথাটা তোমাকে খুলেই বলতে হয়। এই কিছুক্ষণ আগে কর্তাবাবু আমাকে তাঁর খাসমহলে ডেকে নিরিবিলিতে বললেন, ভুসিরাম ছোকরাটাকে সকালে বড় বেইজ্জতি করা হয়েছে রে রাখু! কিন্তু ওর ভালর জন্যই করা। আমি সাজা না দিলে আমার পাইকরা ওকে হাটুরে মার মারত। ওকে একবার ডেকে আনতে পারিস? ওরকম ডাকাবুকো, বুদ্ধিমান একটা ছেলেরই এখন বড্ড দরকার আমার। যেমন তেজালো চেহারা তেমনি সাহস। আজ অবধি কুঠিবাড়িতে ঢোকবার এলেম আর কেউ দেখায়নি। ওকে বলিস সকালে যা হয়ে গিয়েছে, তা যেন মনে না রাখে।"

ভুসিরাম চোখ গোল-গোল করে রাখোহরির দিকে চেয়ে ছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রাখোহরিবাবু, আপনার চেয়ে একটা কেউটে সাপকেও আমার বেশি বিশ্বাস হয়, তা কি জানেন?"

রাখোহরি মাথা নেড়ে বলে, "তা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা আমার দিকটাও তো একটু ভাবতে হবে বাপু! আমি কর্তার নুন খাই, তাঁর পয়সায় আমার প্রতিপালন হয়, ঠিক কি না! তা হলে তুমিই বলো সেই আমি চোখের সামনে কুঠিবাড়িতে একটা জলজ্যান্ত চোরকে দেখেও কীভাবে পাশ ফিরে মটকা মেরে শুয়ে থাকতে পারি? তবে চার-চারজন পাইককে যেভাবে তুমি রাম পটকান দিলে তাতে তোমাকে সাপটে ধরার মতো আহাম্মকি আমি করতে যাইনি। তত দম তো আমার নেই! আমি রোগা-ভোগা লোক। তাই একটু কৌশল করতে হয়েছিল বটে। মারি অরি পারি যে কৌশলে। এখন ভাল করে ভেবে দেখলে আমাকে বোধহয় তোমার তত খারাপ লোক বলে মনে নাও হতে পারে।"

ভুসিরাম আবার একটা ঘাস তুলে নিয়ে তার ডাঁটিটা চিবোতে চিবোতে অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, "আপনি কেমন লোক তা দিয়ে এখন আমার কাজই বা কী? আজকের পর থেকে তো আপনার সঙ্গে আমার আর কোনও কাজ কারবার নেই মশাই! দেখাসাক্ষাতেরও ব্যাপার নেই। আমি তো রওনা হয়েই পড়েছি।"

"আহা, রওনা হতে তো আর ট্রেন বা বাস ধরতে হচ্ছে না! ধীরে-সুস্থে বেশ গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলেই হল। তাড়াহুড়ো করতে গেলে অনেক সময়ে ভুলভালও তো হয়ে যায়! এই তো সেদিন জগদানন্দবাবু হুড়োহুড়ি করে কাশী যেতে গিয়ে কালাহান্ডির ট্রেনে উঠে পড়লেন। আর খগেনবাবুর তো আরও কেলেঙ্কারি, সাঁচী যাবেন বলে বেরিয়ে শেষে করাচিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তাই রওনা হওয়ার আগে সব দিকটা খেয়াল রাখতে হয়।"

ভুসিরাম আবার একটা বড় করে শ্বাস ফেলল। তারপর করুণ গলায় বলল, "দেখাদেখির আর কী আছে বলুন। গোঁজেরহাটের লোক যখন জানতে পারবে যে, কুঠিবাড়িতে চুরি করতে ঢুকে আমি বুরবকের মতো ধরা পড়ে, কান ধরে ওঠবোস করে মান ইজ্জত খুইয়ে এসেছি, তখন লজ্জায় তাদেরও মাথা হেঁট হয়ে যাবে। এর চেয়ে বিরুবাবু আমাকে গুলি করে মারলে বেঁচে যেতাম।"

রাখোহরি হঠাৎ ভারী খুশি হয়ে বলল, "তা তার আর ভাবনা কী? হাতের নাগালেই তো বিরুবাবু রয়েছেন, আর বন্দুকেরও কোনও অভাব নেই। শুভস্য শীঘ্রম। চলো তো, উঠে পড়ো। খুব দয়ার শরীর বিরুবাবুর, কাকুতিমিনতি করলে রাজি হয়ে যাবেন..." বলে হাত ধরে একরকম জোর করেই ভুসিরামকে তুলে ফেলল রাখোহরি।

ভুসিরাম বিরক্ত হয়ে বলে, "অন্যের কাজ ভন্ডুল করা, অন্যের কাজে বাগড়া দেওয়া ছাড়া কি আপনার আর কিছু করার নেই? কাল রাতে তোশাখানার দরজা ফাঁক করার মুখেই আপনি এসে গোলে হরিবোল করে দিলেন। আর এখন এত মেহনত করে গাছে দড়ি বেঁধে শান্তিতে যেই গলায় দড়িটা পরতে যাচ্ছি, অমনি আপনি এসে আগড়মবাগড়ম বকে দিলেন সব গুলিয়ে! গুরুতর কাজের সময় কাউকে এভাবে বিরক্ত করা কি উচিত?"

"ওরে বাপু, ফাঁসিতে মরার চেয়ে গুলিতে মরা অনেক বেশি প্রেস্টিজের ব্যাপার। চলো চলো, আর দেরি নয়, কে জানে বাপু, বারবেলা না পড়ে যায়, অশ্লেষা বা মঘা এসে হাজির হওয়াও বিচিত্র কী!"

॥ ২ ॥

মনসারাম পণ্ডিতের বাবা কুঁড়োরাম বাচস্পতির বয়স এই সাতানব্বই পার হল। না, এমনিতে সব ঠিকঠাকই আছে। খিদে হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ঘুমও দিব্যি আসে। কিন্তু মুশকিল বাঁধিয়েছে আঠেরোটা ছাগল। ইদানীং সেগুলো নিয়েই একটু জ্বালাতন হচ্ছেন কুঁড়োরাম। ঘরের মধ্যে এতগুলো ছাগল একসঙ্গে ঢুকে পড়লে যা হয় আর কী। তারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিছানা বালিশে উঠে পড়ছে, লেপ চাদর খেয়ে ফেলছে, তার উপর চ্যাঁ-ভ্যাঁ ডাকাডাকি তো আছেই। আজ প্রাতঃকালে ঘুম ভেঙে সবে বিছানায় উঠে বসেছেন, দেখলেন মুখোমুখি গোদা ছাগলটা বিছানায় দাঁড়িয়েই কী যেন চিবোচ্ছে। ঠাহর করে মনে হল, তাঁর বড় সাধের লাল মলাটের কুমারনাথের গীতাখানা। মুখের ভাব দেখে মনে হয়, গীতার মতো এমন সরেস খাদ্য কখনও খায়নি। আগে ছাগলদের বেয়াদপি দেখলে কুঁড়োরাম চেঁচামেচি করতেন, ছাগলদের তাড়াও করেছেন, বকাঝকা করতেও বাকি রাখেননি। কিন্তু এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ছাগলদের সঙ্গেই যখন বসবাস করতে হবে, তখন মানিয়ে না নিয়ে উপায় কী? কিন্তু তা বলে তাঁর এত আদরের গীতাখানা চিবোবে এত বেয়াদপি সহ্য হয় না। তাঁর তিন ছেলে, মনসারাম, কামাখ্যারাম আর শীতলারাম। তবে আজকাল কারও নামই তাঁর মনে থাকে না। তাই তিন ছেলের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে একটা নাম বানিয়ে নিয়েছেন, 'কাশীম'। গলা তুলে তিনি হাঁক মারলেন, "ওরে কাশীম, শুনছিস! এ যে বড় অরাজক অবস্থা! দেখে যা বাবা!"

হাঁক শুনে তাঁর মেজছেলে কামাখ্যা গম্ভীর মুখে দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, "বাবামশাই, কিছু বলছিলেন নাকি!"

কুঁড়োরাম অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, "তোমরা সব কোথায় যে থাকো! ওই দ্যাখো, ছাগলটা আমার গীতাখানা চিবিয়ে কী সর্বনাশ করল!"

কামাখ্যা বিচলিত না হয়ে শান্ত গলাতেই বলল, "আপনাকে তো কতবার বলা হয়েছে যে, আপনার ঘরে কোনও ছাগল নেই! আমাদের মোট দুটো ছাগল, দুলালী আর শ্যামলী, আর তারা এখন মাঠে খোঁটায় বাঁধা আছে। আর আপনার গীতা এই তো তাকের উপর রয়েছে।"

"অ! তবে কি আমি ভুল দেখেছি বলতে চাও?"

"যে আজ্ঞে।"

কুঁড়োরাম মুখটা বিরক্তিতে বাঁকা করে বলেন, "ভুল দেখেছি বললেই হল? আঠেরোটা ছাগলকে ভুল দেখতে হলে আঠেরোবার ভুল দেখতে হয়!"

"আঠেরো তো দূরস্থান, আপনার ঘরে একটাও ছাগল দেখতে পাচ্ছি না!"

"ডাক্তার দেখিয়ে চোখে চশমা নাও।"

"সেটা ভেবে দেখবখ'ন।"

কুঁড়োরাম গজগজ করতে করতে আপনমনে বললেন, "আমি নিজে রোজ গুনে দেখেছি, ওই আঠেরোটাই। আমি তো আর অঙ্কে কাঁচা নই যে, গুনতিতে ভুল করব!"

কামাখ্যা নির্বিকার মুখ করে বলল, "আপনি ম্যাট্রিকে অঙ্কে বাইশ পেয়েছিলেন।"

কুঁড়োরাম যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "নাকি?"

"হ্যাঁ। আপনি নিজের মুখেই কবুল করেছেন।"

কুঁড়োরাম জুলজুল করে একটু কামাখ্যার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "আর পাঁচটা বিষয়ে যে লেটার পেয়েছিলাম, সেটা বুঝি কিছু নয়?"

কামাখ্যা তেমনি নির্বিকার মুখে বলে, "না বাবামশাই, আপনি শুধু সংস্কৃত আর বাংলায় লেটার পেয়েছিলেন। তাতে অঙ্কের খামতি পূরণ হয় না।"

"হয় না?" বলে কুঁড়োরাম কিছুক্ষণ মুখখানা তোম্বা করে বসে রইলেন। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তোমরা সহবত শেখোনি। বড়দের সঙ্গে কথা কইতে জানো না, কেবল মুখে-মুখে তর্ক করো। আমার কোনও কথাই তোমাদের বিশ্বাস হতে চায় না কেন বলো তো! এই যে সন্ধের পর মাঝে-মাঝে আমি কুঠিবাড়ির কাছারিঘরে বসে জন্মেজয়বাবুর সঙ্গে দাবা খেলে আসি তা নিয়ে তোমরা হাসিমশকরা করো। কুলতলার মাঠে যে সেদিন আমি বেলুনের মতো গোল একটা মানুষকে দেখেছি, সেটাকে তোমরা চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিলে! সেদিন যে জোছনারাতে কয়েকটা রোগা আর লম্বা মানুষ পুব দিকের পোড়ো জমিটায় হুটোপাটি করছিল, সে কথাটাও তোমরা বিশ্বাস করলে না! আর সেইজন্যই আমি আজকাল পারতপক্ষে তোমাদের কাছে কিছু বলি না। অনেক কথাই চেপে রাখতে হয়।"

কামাখ্যা বিনা প্রতিবাদে সব শুনে বলল, "এখন ছাগলগুলোকে কি আর দেখতে পাচ্ছেন বাবামশাই?"

কুঁড়োরাম অসহায় গলায় বলেন, "লোক দেখলে ওরা গা-ঢাকা দেয় কিনা! উঁকি মেরে দ্যাখো তো, বোধহয় খাটের তলায় সব জড়ো হয়েছে।"

কামাখ্যা বাধ্য ছেলের মতো খাটের নীচে উঁকি মেরে দেখে বলল, "আজ্ঞে না বাবামশাই, খাটের নীচে একটাও ছাগল নেই।"

ভারী অবাক হয়ে কুঁড়োরাম বলেন, "নেই? তা হলে তারা গেল কোথায় বলো তো! একটা দুটো তো নয়! আঠেরোটা ছাগল! এতগুলো ছাগল তো আর হাওয়া হয়ে যেতে পারে না!"

কামাখ্যা শান্ত গলাতেই বলে, "বেলা হয়ে যাচ্ছে বাবামশাই, আপনি বরং আহ্নিক সেরে নিন।"

একথা শুনে ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে কুঁড়োরাম বলেন, "আহ্নিক কি আমাকে মনে করাতে হবে নাকি? সে হবেখ'ন। আগে ছাগলগুলোর একটা বিলিব্যবস্থা করো দিকি।"

"একটু আগেই তো আপনি ছাগলের নামে নালিশ করছিলেন, এখনই আবার তাদের জন্য উতলা হয়ে পড়ছেন যে বড়!"

"আহা, তুমি বুঝতে পারছ না, তারা আমাকে জ্বালাতন করে বটে, কিন্তু সঙ্গও তো দেয়! আমার খবরাখবর আর কে নেয় বলো! তোমার গর্ভধারিণী সংসার নিয়ে উদয়াস্ত ব্যস্ত, তোমরাও তো নিজের-নিজের কাজকর্ম নিয়ে ছোটাছুটি করছ, নাতি-নাতনিরা লেখাপড়া করে আর সময় পায় না, আর আমি বুড়ো মানুষটা

একলাটি পড়ে থাকি। আমার কি আর যত্নআত্তি কিছু হচ্ছে! আমার কাছটিতে তো কেউ নেই যার সঙ্গে একটু সুখদুঃখের কথা কইতে পারি।”

কামাখ্যা একটু বিস্মিত হয়ে বলে, “বলেন কী বাবামশাই, আমরা কি প্রাতঃকালে এসে আপনাকে প্রণাম করে যাই না? আপনার সকালের জলখাবার থেকে রাতের খইদুধ কি আমার মা যত্ন করে আপনাকে খাইয়ে দিয়ে যান না? আপনি কখন কেমন আছেন বা থাকেন তার খোঁজ কি ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাড়ির সবাই নেয় না? আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল আছে যে, কেবল আপনার খিদমত খাটার জন্যও একজন লোক দিনরাত বহাল আছে, কিন্তু আপনি তাকে কাছেই ঘেঁষতে দেন না, কারণ আপনার সন্দেহ যে, সে আপনার গোপন তবিলের সন্ধান পেয়ে যাবে।”

“আহ! তুমি তো বড্ড বাচাল দেখছি হে! হচ্ছিল ছাগল নিয়ে একটা গুরুতর কথা, তার মাঝখানে গুচ্ছের আজেবাজে কথা এনে ফেললে!”

কামাখ্যা তটস্থ হয়ে বলে, “বাবামশাই, আমি ভেবেছিলাম ছাগল নিয়ে বোধ হয় আপনার সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছে।”

কুঁড়োরাম ভ্রূ কুঁচকে ছেলের দিকে খানিক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, “আচ্ছা, তুমি ছাগলগুলোকে দেখতে পাচ্ছ না কেন বলো তো? তুমি পাচ্ছ না, তোমার দাদা-বউদিরা পাচ্ছে না, তোমাদের গর্ভধারিণী পাচ্ছেন না, কাজের লোকেরা পাচ্ছে না, তোমাদের হলটা কী?”

কামাখ্যা খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলে, “এর একটা সহজ জবাব আছে বটে, তবে সেটা শুনলে আপনি খুশি হবেন না।”

“ইঃ! যেন আমাকে খুশি করার জন্য তোমাদের ঘুম হচ্ছে না!”

“যদি রাগ না করেন তো বলি, আপনি যে ছাগলদের দেখতে পান সেগুলোকে ইংরিজিতে বলে ভারচুয়াল ছাগল, আসল ছাগল নয়।”

“তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে বল তো?”

কামাখ্যা মাথা চুলকে বলে, “কী যে বলি! তবে মায়াছাগল বললে কেমন হয় তাই ভাবছি।”

কুঁড়োরাম একটু ঝেঁকে উঠলেন, তারপর বেশ প্রসন্ন গলাতেই বললেন, “তুমি কি বলতে চাও যে, আমি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি! তোমরা যা দেখতে পাও না, তা আমি পাই!”

“তাই তো মনে হচ্ছে।”

কুঁড়োরাম একথায় খুশিই হলেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “কথাটা মন্দ বলোনি। আর না হবেই বা কেন বলো! বহুকাল ধরে পুজোপাঠ, আহ্নিক, সাত্ত্বিক আচরণ, তার তো একটা ফলও আছে! কী বলো?”

“আজ্ঞে সে তো হতেই পারে!”

কুঁড়োরাম চারদিকে টালুমালু করে চেয়ে দেখে নিচ্ছিলেন, একটু লাজুক হাসি হেসে বললেন, "দিব্যদৃষ্টি জিনিসটা মন্দ নয়, বুঝলে! আমারও ক'দিন ধরে কেমন যেন মনে হচ্ছিল, আমি যেন সব অন্য রকম দেখতে পাচ্ছি।"

"তা হলে কি একবার চোখের ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন?"

“বলো কী? দিব্যদৃষ্টিতে তো আমি দিব্যি সব দেখতে পাচ্ছি। চশমারও প্রয়োজন হচ্ছে না। ওই যে, পুব দিকের দেয়ালে একটা টিকটিকি খণ্ড ত-এর মতো ঝুলে আছে, দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, তারপর ধরো, ওই যে বাংলা ক্যালেন্ডারে আজ সাতুই ভাদ্র, দিব্যি ঠাহর হচ্ছে, তারপর ধরো না কেন টুলের উপরে কাচের গেলাসে আমার দু'পাটি দাঁত জলে ভেজানো আছে, দেখতে কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না। এর পরও কি চোখের ডাক্তার দেখাতে চাও?”

“আজ্ঞে না। চোখ আপনার ঠিকই আছে। তবে আমার যদি খুব ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে আমার যেন মনে হচ্ছে আপনি এখন চশমা পরেই আছেন।”

“নাকি?”

“যে আজ্ঞে, চশমা বলেই তো মনে হচ্ছে।”

কুঁড়োরাম চোখ থেকে চশমাটা খুলে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, “এটার আর কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, বুঝলে! হরিহর মুহুরির চোখের ব্যামো হয়েছে, পয়সার অভাবে চিকিচ্ছে করাতে পারছে না। সেদিন আমার কাছে পুরনো চশমা আছে কি না খোঁজ করছিল। ভাবছি ওকেই এটা দিয়ে দেব। কী বলো?”

কামাখ্যা ভারী উদার গলায় বলে, “তা দেবেন। তবে কিনা আপনার দিব্যদৃষ্টির চশমা পরে আবার হরিহর মুহুরির দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলে কী হবে, সেটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। দ্রব্যগুণ বলেও তো একটা কথা আছে কিনা।”

কুঁড়োরাম একথায় একটু ভাবিত হয়ে পড়লেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, “সেটাও একটা কথা। তা হলে বরং থাক।”

“যে আজ্ঞে।”

কামাখ্যা চলে যাওয়ার পর কুঁড়োরাম বেশ একটু ডগোমগো ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। বারকয়েক আপনমনে উচ্চারণ করলেন, “মায়াছাগল, মায়াছাগল!”

প্রাতঃকৃত্য সেরে যখন আহ্নিকে বসেছেন তখন হঠাৎ রোমাঞ্চিত কলেবরে টের পেলেন, গুটগুট করে তাঁর ছাগলেরা ফিরে আসছে। আহ্নিক শেষ করার পর দেখলেন, তাঁকে ঘিরে আঠেরোটা ছাগল বসে মায়াভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। আহ্লাদে চোখে প্রায় জল এসে গেল তাঁর। একটা-দুটো তো নয়, মোট আঠেরোটা ছাগল! যাদের পাপচক্ষু, যাদের দিব্যদৃষ্টি নেই, তারা দেখতে পায় না।

খানিকটা অভিভূত ভাব নিয়ে কুঁড়োরাম ছাগলদের মাঝখানটিতে বসে রইলেন। মায়াছাগল আর দিব্যদৃষ্টি, এদুটি কথা তাঁর মাথার ভিতর যেন ঝুমঝুমি বাজাতে লেগেছে আজ। বড় আনন্দ হচ্ছে।

“বলি ও বুড়োকর্তা, ছাগলগুলো মাথাপিছু কত করে পড়ল বলুন তো! দিব্যি নধর ছাগল মশাই আপনার!”

কুঁড়োরাম তাঁর অভিভূত ভাবটা থেকে ভেসে উঠতে বেশ একটু সময় নিলেন। অনেকটা গভীর জলে ডুবে ছিলেন তো! কোন বেয়াদব হেঁড়ে গলায় রসভঙ্গ ঘটাল, তা রোষকষায়িত নয়নে খুঁজে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল, পুবের জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে একটা খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা, গ্যালগ্যালে বোকা হাসিতে ভরা, জুলজুলে চোখের গোলগাল মুখ উঁকি দিয়ে আছে। পিত্তি জ্বলে গেল কুঁড়োরামের। এত বড় বুকের পাটা যে, ছাগলের দাম জিজ্ঞেস করছে!

কুঁড়োরাম ফুঁসে উঠে বললেন, "কে রে আহাম্মক! এ কি এলেবেলে ছাগল পেয়েছিস যে দাম জিজ্ঞেস করছিস?"

লোকটা চোখ বড় বড় করে বলে, "তা বুড়োকর্তা কি ছাগলগুলো বিলেত থেকে আমদানি করলেন নাকি! কিন্তু আমি হলুম গে তিন পুরুষের ছাগলের কারবারি গন্ধেশ্বর, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি সোজা কথা কর্তা? ছাগল আমি খুব চিনি। এ তো নিকষ্যি দিশি ছাগল!"

কুঁড়োরাম খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তাই তো, আর কেউ তাঁর ছাগলদের দেখতে না পেলেও এই লোকটা পাচ্ছে কী করে? তিনি এবার গলাটা কয়েক পরদা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাপু হে, তুমি কি আমার ছাগলদের দেখতে পাচ্ছ?"

"তা পাব না কেন কর্তা? ছাগলের গায়ের বোটকা গন্ধ পেয়েই তো জানালায় উঁকি দিলুম।"

কুঁড়োরাম এবার বুদ্ধি খাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"তা হলে বলো তো, এখানে ক'টা ছাগল আছে?"

"সে আর বলা শক্ত কী! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো ছাগলই গুনছিলাম কিনা! তা কর্তা, আপনার মোট আঠেরোটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। একটা কমও নয়, একটা বেশিও নয়।"

কুঁড়োরাম তাজ্জব! এ লোকটারও কি দিব্যদৃষ্টি গজিয়েছে নাকি? জনে-জনে দিব্যদৃষ্টি গজালে দিব্যদৃষ্টির মহিমা কি থাকবে?

কুঁড়োরাম খুবই চিন্তিত হয়ে বললেন, "বাপু হে, এ ছাগল দেখতে পাওয়ার কথাই তো তোমার নয়! এ যে মায়াছাগল! তুমি দেখতে পাচ্ছ কী করে?"

"বুড়োকর্তা, ছাগলের কারবারে চুল পাকিয়ে ফেললুম, এখন মায়াছাগল বলে দাম বাড়ানোর চেষ্টা করলে তো লাভ হবে না।"

কুঁড়োরাম হাঁ। মাথাটা ভারী গোলমেলে লাগছে। তা হলে এগুলো কি মায়াছাগল নয়? নিতান্তই ছাগল! তাই যদি হবে, তা হলে তাঁর বাড়ির লোকেরা দেখতে পাচ্ছে না কেন? এ তো বড় ধন্দেই পড়া গেল!

লোকটা ভারী আদুরে গলায় বলে, "বলি ও কর্তা, অত ভাবনার কী আছে? মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা করে দিচ্ছি, ছাগলগুলো আমাকে দিয়ে দেন।"

কুঁড়োরাম ভ্রূ কুঁচকে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলেন, "রোসো বাপু, ছাগল নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। আগে সাব্যস্ত হওয়া দরকার যে, এগুলো আদপে ছাগল না অন্য কিছু।"

"বলেন কী বুড়োকর্তা! ছাগল চিনতে কি আর এম এ পাশ করতে হয়! আমি তো ছাগল ঘেঁটেই জীবন পার করে দিলাম।"

কুঁড়োরাম লোকটার দিকে জুলজুল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তা হলে তুমি বলছ যে, এগুলো নিতান্তই ছাগল! ভাল করে দেখে বলছ তো বাপু?"

"তা নয়তো কী? আপনার কি ওগুলোকে বাঘ বা সিংহি বলে মনে হচ্ছে বুড়োকর্তা? পাঁচটা পাঁঠা, তেরোটা ছাগী, একেবারে সোজা হিসেব। তার মধ্যে দুটো ছাগী গাভীন।"

ছাগল সম্পর্কে লোকটার জ্ঞান দেখে কুঁড়োরাম মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এত জানে! তিনি তো এতদিন ছাগলের সঙ্গে ঘর করেও এত কিছু জানতে পারেননি! তিনি ভারী আহ্লাদের সঙ্গে বললেন, "বাপু গন্ধেশ্বর, তুমি বরং ঘরে এসে একটু বসে যাও। তোমার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।"

গন্ধেশ্বর এক গাল হেসে বলে, "যে আজ্ঞে। সে আর বেশি কথা কী? তবে কিনা ছাগলের বাইরে আমি কিন্তু কিছু জানি না।"

"আহা, ছাগল সম্পর্কে জানা হয়ে গেলে আর জানার বাকি থাকে কী?"

"আজ্ঞে সেটা অবশ্য ঠিক কথা।"

গন্ধেশ্বর জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে ফের দরজা দিয়ে উদয় হল। লোকটা বেঁটেখাটো, বেশ জোয়ান চেহারা, মুখে একটা বোকা-বোকা হাসি আছে বটে, কিন্তু চোখ দু'খানা ভারী ধূর্ত বলেই যেন এক ঝলকে মনে হল কুঁড়োরামের। তবে এসব ছোটখাটো ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যেই ধরলেন না তিনি। ছাগল সম্পর্কে যার এত জ্ঞান সে যে উঁচু থাকের লোক, তাতে সন্দেহ কী! জ্ঞানী মানুষ।

কুঁড়োরাম গলাটা এক পরদা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাপু গন্ধেশ্বর, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো! তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই ছাগলদের আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না কেন? আমার কাছে কবুল করো তো, তুমিও কি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছ?"

গন্ধেশ্বর সরাসরি কথাটার জবাব না দিয়ে হঠাৎ দু'হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেলে বলল, "বুড়োকর্তা, কাজটা কি আপনি ভাল করলেন?"

কুঁড়োরাম অবাক হয়ে বললেন, "কোন কাজটার কথা বলছ হে!"

"এই যে চেনা নেই, জানা নেই, একটা উটকো অচেনা লোককে ঘরে ঢুকিয়ে ফেললেন, এটা কি ঠিক হল মশাই? আমি যে সব দেখে ফেলছি। সব সুলুকসন্ধান পেয়ে যাচ্ছি! না কর্তা, আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা কয়ে চলে যাই।"

কুঁড়োরাম ভড়কে গিয়ে বলেন, "আহা কী দেখেছ সেটা বলবে তো!"

"কী আর বলব বলুন, আপনার সোনাদানা, আকবরি মোহর, নোটের গোছা কিছুই যে আর আমার কাছে গোপন থাকছে না! আমাকে বিশ্বাস কী বলুন! না, না, এ কাজটা আপনি মোটেই ভাল করলেন না।"

কুঁড়োরাম অবাক হয়ে বললেন, "সত্যিই কি তুমি ওসব দেখতে পাচ্ছ নাকি হে!"

"আজ্ঞে, ওটাই তো আমার রোগ। আমি যে সব দেখতে পেয়ে যাই। তা হলে আমি আসি আজ্ঞে। আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বড় ভাল লাগল বুড়োকর্তা!" বলে চোখ ঢাকা অবস্থাতেই উঠে পড়তে যাচ্ছিল গন্ধেশ্বর।

কুঁড়োরাম "আহা, করো কী, করো কী!" বলে তাকে আবার মোড়ায় ঠেসে বসালেন। তারপর বললেন, "ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবে তো!"

গন্ধেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "কী করে বোঝাব বলুন, আপনার যে মোটে বিশ্বাসই হবে না।"

"বলেই তো দেখো বাপু।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গন্ধেশ্বর বলে, "গত আশ্বিনের ঘটনা মশাই, চকবেড়ের হাট থেকে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরছি। সঙ্গে কেউ নেই। বকডিহির ঝিলের কাছাকাছি আসতেই একটা শ্যামাপোকা কোত্থেকে বোঁ করে উড়ে এসে বাঁ চোখটায় ঢুকে গেল। সে কী যন্ত্রণা বাবা, প্রাণ যায়! চোখ পাউরুটির মতো ফুলে গেল, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। ভয় খেয়ে গেলাম, বাঁ চোখটা কানা হয়ে গেল নাকি! গরিব মানুষ, চিকিচ্ছে করানোর মতো মামলোত নেই। কিন্তু দিনসাতেক বাদে, কী বলব মশাই, এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি চোখ ফরসা হয়ে

গিয়েছে। বেশ দেখতেও পাচ্ছি। কিন্তু একটু যেন কেমন-কেমন, যেন একটু বেশিই দেখে ফেলছি। ধরুন, পরেশবাবু চটের থলিতে কইমাছ নিয়ে যাচ্ছেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যোগেশবাবুর পকেটে একান্ন টাকা আছে, দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, কদমবাবুর জামার নীচে ছেঁড়া গেঞ্জি... দেখতে কোনও অসুবিধেই হল না আমার। তখনই ভয় পেয়ে গেলুম, এই রে এত দেখে ফেললে তো মনে লোভ জেগে উঠবে, তার জেরে হয়তো পাপই করে ফেলব!"

কুঁড়োরাম হামলে পড়ে বললেন, "তারপর কি দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল নাকি?"

গন্ধেশ্বর মাথা নেড়ে বলে, "না বুড়োকর্তা, দিব্যদৃষ্টি অনেক উপরের ব্যাপার। যদি 'তৃতীয় নয়ন' বলি, তা হলেও বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। দরকারের সময়ে জুতসই শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না মশাই! তবে কাজ চালানোর জন্য 'তিন নম্বর চোখ' বলা যায় কি?"

"খুব বলা যায়।"

"তা সেই থেকে আমি বড় একটা কারও ঘরেদোরে ঢুকি না। কোথায় কী দেখে ফেলব কে জানে মশাই! ঢুকতে হলে বাঁ চোখটা চেপে রেখে ঢুকি। এই বাঁ চোখটাই গোলমেলে কিনা।"

"বটে!" কুঁড়োরামের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, "তুমি তো সোজা পাত্তর নও গন্ধেশ্বর!"

গন্ধেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "না মশাই, আমি যে ছাগলের কারবারি সে ছাগলের কারবারিই রয়ে গিয়েছি। তিন নম্বর চোখ হয়েও আমার কিছু সুবিধে হয়নি।"

"বলো কী! কিছু হয়নি বললেই হল! ওই যে আমার ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে শ্বেত পাথরের বেদিটা রয়েছে, ওর উপরের পাথরটা আলগা, ওটা সরালেই নীচে আমার তবিল, এ খবর কাকপক্ষীতেও জানে না, কিন্তু তুমি জানলে কী করে?"

গন্ধেশ্বর তাড়াতাড়ি কানে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "আর ক'বেন না কর্তা, বাইরের লোককে এত বিশ্বাস করা আপনার একদম উচিত হচ্ছে না।"

"আহা, তুমি বাইরের লোক হতে যাবে কেন? তুমি তো এক রকম ঘরের লোকই হয়ে গিয়েছ। আমার গোপন তবিলের খবর যখন তুমি রাখো, তখন আর তোমাকে পর ভাবি কী করে?"

"হ্যাঁ, সেটা একটা ভাববার মতো কথা বটে!" বলে আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ট্যাঁক থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বলল, "বুড়োকর্তা, এই আগামটা রাখুন। বাকি উননব্বই হাজার নশো পঁচানব্বই টাকা নগদ ফেলে দিয়ে দু'-চারদিন পরে এসে ছাগলগুলো নিয়ে যাব'খন।"

কুঁড়োরাম মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, "আরে না, না, তোমার ওসব আগাম-টাগাম লাগবে না।"

গন্ধেশ্বর টাকাটা ফের ট্যাঁকে গুঁজে উঠে পড়ল, "তা হলে আজ আসি কর্তা। নগদ টাকাটা নিয়ে ফের এলুম বলে।"

কুঁড়োরাম গদগদ গলায় বললেন, "এসো বাপু, তুমি বড্ড গুণী মানুষ।"

গন্ধেশ্বর বিদেয় হলে কুঁড়োরাম তাঁর ছাগলদের দিকে চেয়ে ধরা গলায় বললেন, "তোদের ভাগ্য বড় ভাল রে! এমন একজন সমঝদার লোকের হাতে যাচ্ছিস।"

লোকটা কতখানি সমঝদার, তা অবশ্য পরদিন সকালেই বোঝা গেল। প্রাতঃকালে সবে ঘুম থেকে উঠে ইষ্টনাম নিতে যাবেন এমন সময়ে ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে কুঁড়োরাম হাঁ। কাঠের সিংহাসনটা বেদি থেকে

নামানো, শ্বেতপাথরের ঢাকনাও সরানো। কুঁড়োরাম হাঁক মারলেন, "কাশীম, কাশীম, কোথায় গেলি রে!"

মেজছেলে শীতলারাম এসে দরজায় দাঁড়াল, "বাবামশাই কি কিছু বলছিলেন?"

কুঁড়োরাম তেতো গলায় বললেন, "এ বাড়িটা কি একটা খোলা হাট হয়ে গিয়েছে? কে এসেছিল বলো তো আমার ঘরে? ওই দ্যাখো আমার ঠাকুরের আসন ওলটপালট করে গিয়েছে।"

শীতলারাম ঘরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখে বলে, "এ তো মনে হচ্ছ চোরের কাজ।"

কুঁড়োরাম অবাক হয়ে বলেন, "চোর! বলো কী! দ্যাখো তো ওই বেদির ফোকরটায় হাত ঢুকিয়ে দ্যাখো, কিছু আছে কি না!"

শীতলা গিয়ে ফোকরটায় হাত ঢুকিয়ে একটা পাঁচ টাকার কয়েন তুলে এনে বলল, "এটা ছিল।"

"আর কিছু নেই?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হলে আমার তবিল?"

শীতলা কিছুটা অবাক হয়েই বলে, "আপনার তবিল কি এখানে ছিল?"

"তা নয় তো কী! পাঁচ-সাত লাখ টাকার সোনা, নগদও ধরো লাখতিনেক। আকবরি মোহরও বেশ কয়েকটা।"

"বলেন কী?"

"তোমাদের কি কোনও দিকে হুঁশ আছে! সবাই তো ভোঁসভোঁস করে ঘুমোও! এত বড় একটা চুরি হয়ে গেল, কেউ কিছু টের পেলে না!"

শীতলা কামাখ্যার মতো বিনয়ী নয়। সে বেশ কড়া গলায় বলল, "কাল সকালের দিকে আপনার ঘরে নাকি একজন সন্দেহজনক লোক এসেছিল আর আপনি নাকি তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাও বলেছেন?"

"আহা সে তো গন্ধেশ্বর। তার কথা উঠছে কেন?"

"গন্ধেশ্বরটা আবার কে? আপনি তাকে চেনেন?"

"চিনব না কেন, খুব চিনি। সে একজন ছাগলের কারবারি। তবে মানুষটার অনেক গুণ, বুঝলে!"

ভ্রূ কুঁচকে শীতলা বলে, "ছাগলের কারবারি! তো তার সঙ্গে আপনার দহরম-মহরম কীসের?"

"সে তোমরা বুঝবে না। তার তৃতীয় নয়ন ফুটেছে সম্প্রতি। সেই নিয়েই কথা হচ্ছিল।"

"তৃতীয় নয়ন মানে! তিন নম্বর চোখ?"

"হ্যাঁ হে! আর তৃতীয় নয়নে সে অনেক কিছু দেখতে পায়। এই যেমন আমার ছাগলগুলোকে তোমরা দেখতে পাও না, সে কিন্তু দিব্যি দেখতে পেল, তারপর ঘরে ঢুকেই তো বলে দিল আমার কোথায় কী লুকোনো আছে।"

"তা হলে চোরকে আর গোরুখোঁজা করতে হবে না। আপনার গন্ধেশ্বরই চোর।"

ভারী অবাক হয়ে কুঁড়োরাম বললেন, "বলো কী হে! সে তো দু'-একদিনের মধ্যেই আমাকে ছাগলের জন্য টাকা দিতে আসবে।"

শীতলা বেশ ধমকের গলায় বলে, "তার মানে? আপনি কি তাকে ছাগলও বেচতে চান নাকি? কিন্তু আপনি ছাগল পাবেন কোথায়?"

"আহা, আমার মায়াছাগলদের কথাই হচ্ছে।"

"মায়াছাগলও বেচা যায় নাকি? তা হলে আপনার গন্ধেশ্বর বোধহয় সেগুলো মায়াটাকায় কিনবে।"

কুঁড়োরাম বুঝতে পারছিলেন তাঁর কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। জুলজুল করে শীতলার রাগী মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, "তোমাদের মুশকিল কী জানো! তোমরা অল্পবয়সেই বড্ড বেশি বুঝে ফেলো।"

"এখন থেকে আপনি একটু কম বোঝার চেষ্টা করলে ভাল হয়।"

॥ ৩ ॥

গয়াবুড়ির সঙ্গে বীরবাহুর বনিবনা হয় না মোটেই। বীরবাহু গেরামভারী লোক, তার কর্মচারীরা তো বটেই, বন্ধুরা অবধি বিরুকে সামলে চলে। সে কুঠিবাড়িতে এলে গোটা বাড়িটাই তটস্থ। বাদ শুধু গয়াবুড়ি। ভয় তো খায়ই না, উলটে তার শাসন আর খবরদারিতে বিরু অতিষ্ঠ... "ও বিরু, খেতে বোস, ও বিরু চান করতে যা, ও বিরু, রাত হয়ে গিয়েছে বাবা শুয়ে পড়, ও বিরু, তুই হাঁফাচ্ছিস কেন, একটু জিরো তো!'..."

মাঝে-মাঝে বিরু কথা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখেছে, লাভ হয়নি। কথা বন্ধ করা তো এক তরফে হয় না! দু'তরফই লাগে। কুঠিবাড়িতে এলেই বিরুর এই এক জ্বালাতন। শুতে, বসতে, খেতে, ঘুমোতে সর্বদাই গয়াবুড়ির খবরদারিতে থাকতে হয় তাকে। গয়াবুড়ির বয়স কত কেউ জানে না, গয়াবুড়ি নিজেও নয়। তবে বীরবাহু জন্মাবধি গয়াবুড়িকে দেখে আসছে। জন্মেও এই গোঁজেরহাটের বাইরে যায়নি গয়াবুড়ি, কুঠিবাড়ির বাইরেও সে কদাচিৎ যায়। একবার বীরবাহু গয়াবুড়ির হাত থেকে খানিক রেহাই পাওয়ার জন্য তাকে নিজের খরচে কাশীবাস করতে পাঠাতে চেয়েছিল। শুনে গয়াবুড়ির সে কী চেঁচামেচি, "কোন পাপ করিছি রে যে আমাকে কাশীতে পাঠাতে চাস? কখনও কোনও অধর্ম করতে দেকেছিস আমায়? বাবা বিশ্বনাথ আমার মাথায় থাক, পাণ্ডাদের ঝ্যাঁটার বাড়ি খেতে যাব কোন দুঃখে..." বিরু হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বুড়িকে আর পারতপক্ষে ঘাঁটায় না। তবে মানুষটার কোনও বায়নাক্কা নেই। সারাদিন, উদয়াস্ত এই কুঠিবাড়ির উপর থেকে নীচ এবং আনাচকানাচ টুকটুক করে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় আর আপনমনে বকবক করে। এই বাড়ির উপর বড্ড মায়া বুড়ির। এই কুঠিবাড়িই তার কাশী, গয়া, বৃন্দাবন।

তাই কোনও বেগোছ দেখলে বুড়ি রুখে দাঁড়ায়। আজ সকালেই এক কলসারাইয়ের মিস্তিরি এসেছে। বেঁটেখাটো মজবুত চেহারা। গয়াবুড়ি তার কাছে এসে আগাপাশতলা দেখে নিয়ে বলল, "অ্যাই মিনসে, তুই না গত আষাঢ় মাসে দোতলার জানালার খড়খড়ি সারিয়ে গেলি!"

লোকটা নির্বিকার গলায় বলে, "সে আমি নয় গো মাসি।"

"তোর নাম গ্যানা নয়?"

"না গো মাসি, আমি গুণেন।"

"আরও কথা আছে বাছা, জষ্টি মাসের ঝড়ে দক্ষিণের বাগানে আম গাছটা উপড়ে দেয়াল খানিকটা ভেঙে পড়েছিল, দেয়াল সারাতে তো রাজমিস্তিরি সেজে তুই-ই এসেছিলি বাছা! বেশ মনে আছে তখন নাম বলেছিলি, গণেশ।"

"আমি কোন দুঃখে গণেশ হতে যাব গো মাসি! তুমি বুড়ো হয়েছ, ভুলভাল দেখছ।"

"শুধু তাই নয় বাপু, গত চোত সংক্রান্তির আগের দিন দুর্গাপদধোপার ভাইপো বলে এসে এ বাড়ির বত্রিশখানা চাদর নিয়ে হাওয়া হয়েছিল কে বল তো! সেবার তো নাম বলেছিলি, গজপতি।"

অখণ্ড মনোযোগে কল সারাতে সারাতে লোকটা বলে, "তোমার ভীমরতি হয়েছে গো মাসি!"

"ভীমরতি হোক আমার শত্তুরের। বলি তুই কি বিশ্বকর্মা? দুনিয়ার সব মেরামতির কাজ একটা মিস্তিরিই করছে জন্মে দেখিনি বাবা! তা তুই যদি এমন চৌখস মিস্তিরিই হলি, তা হলে তোর চোখ চারদিকে বনবন করে ঘোরে কেন রে? কুদৃষ্টি দিস নাকি? আড়ে-আড়ে চোখ রাখছিস কোথায় কী আছে?"

এত কথাতেও লোকটা চটল না। মিটিমিটি হেসে বলে, "না মাসি, আমি মিস্তিরি মানুষ, অন্যদিকে চোখ দিলে কি চলবে? তোমার বয়স হয়েছে মাসি, এবার চোখের ডাক্তার দেখাও।"

"ওরে আমি ভুল দেখলে অনেকের সুবিধে হয়, সে আমি জানি। কিন্তু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আজও আমার চোখে চালসে ধরেনি, বুঝলি? বলি তোর মতলবটা কী? চুরি-ডাকাতি করতে ঢুকেছিস নাকি?"

"ও কথা শোনাও পাপ।"

"এঃ বড্ড ভালমানুষ দেখছি!" বলেই গয়াবুড়ি দোতলার দিকে মুখ তুলে তার খনখনে গলায় চেঁচাল, "বলি ও বিরু! শুনছিস! ওরে ও বিরু!"

দোতলার জানালার পাল্লাটা খুলে বীরবাহু বাজখাঁই গলায় হুংকার দিল, "কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?"

"চেঁচাই কি আর সাধে বাছা! দ্যাখ না, এই লোকটা বারবার হরেক রকম মিস্তিরি সেজে ঘোরাফেরা করছে। কখনও ছুতোর, কখনও রাজমিস্তিরি, কখনও কলসারাইয়ের কারিগর, যেন বহুরূপী। কী মতলব, তা বুঝতে পারছি না। দিনকাল তো ভাল নয়।"

বিরু ভারী বিরক্ত হয়ে বলে, "তোমার কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, মিস্তিরির পিছনে লেগেছ! যাও না ঘরে বসে একটু হরিনাম করোগে না!"

গয়াবুড়ি অবাক হয়ে বলে, "হরিনাম করব! হরিনাম করব কেন রে? আমার কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এয়েছে!"

বীরবাহু এবার একটু নরম হয়ে বলে, "বাড়ি পাহারা দেওয়ার লোক তো রয়েছে, তোমার অত খবরদারির দরকার কী? বরং ঘরে গিয়ে একটু জিরোও। বয়সের কথাটাও তো খেয়াল রাখতে হয়!"

"বয়সের খোঁটা দিচ্ছিস কেন রে? বয়স হয়েছে তো কী, বয়স কোলে করে বসে থাকলে কি আমার চলবে! যখন রাতবিরেতে বড় কর্তাবাবু তলব করে বাঘা গলায় কৈফিয়ত চাইবেন তখন কী বলব, বল তো! জন্মেজয় ভঞ্জকে তো দেখিসনি! এই তোর চাইতেও এক বিঘত লম্বা, আর ওই সদর দরজাটার মতোই চওড়া বুকের পাটা।"

"তোমার মাথাটাই গিয়েছে। জন্মেজয় ভঞ্জ যে পঞ্চাশ বছর আগেই গত হয়েছেন, সে খেয়াল আছে?"

"ও মা! গত হয়েছেন তো কী হয়েছে, তা বলে কি যাতায়াত নেই নাকি! এই তো কাল নিশুত রাতে ডেকে পাঠিয়ে কত কথাই বললেন। বললেন, 'ওরে গয়া, বিরু শিকারি বলে এ কাদের ধরে নিয়ে এসেছে বল তো! শিকার করবে কী, এরা তো বন্দুক ধরতেই জানে না! গতকাল আসমানির চরে একান্নবার গুলি চালিয়ে একটা পাখিও মারতে পারেনি। আর পারবেই বা কী করে! কোনওটার হাত কাঁপে, কোনওটার বাতব্যাধি, কোনওটা চোখে কম দেখে, কোনওটা নুলো! ছ্যা ছ্যা! এসব বুড়োধুড়ো লোককে দিয়ে কি শিকার হয়! তার উপর দিনরাত গান্ডেপিন্ডে গিলছে, ওতেই তো হাতের টিপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। ওই গুঁফো শিকারিটা তো কাল রাতে দেড় সের মাংস খেয়েছে। কী নোলা বাবা!' "

বীরবাহু রেগে গিয়ে "তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি!" বলে জানালার পাল্লাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

গুণেন মিস্তিরি আড়ে-আড়ে সবই লক্ষ করছিল, কাজ করতে করতেই ভালমানুষের মতো বলল, "বুঝলে মাসি, কর্তাবাবুদের দোষ কী জানো? ওরা এই তোমার-আমার মতো মনিষ্যিদের কথা কানেই তুলতে চান না। তুমি তো ভাল ভেবেই বলেছ, আর কথাটা তো কিছু খারাপও বলোনি। আমি একটা উটকো লোক বই তো নয়। মিস্তিরি সেজে কত চোরছ্যাঁচোড় তো হামেশা লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। আর আমাকেই বা বিশ্বাস কী বলো! না, না, আমার তো মনে হয় বিরুবাবু কাজটা ঠিক করেননি। তোমার কথাটা ওঁর ভেবে দেখা উচিত ছিল।"

গয়াবুড়ি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তবেই বোঝো বাবা, যার জন্য চুরি করি সে-ই বলে চোর। এই তুই ভালমানুষের ছেলে, তাই বুঝলি, আর কি কেউ বোঝে?"

গুণেন দুঃখ করে বলে, "বাবুমশাইরা না বুঝলেও আমরা বুঝি, তুমি কেমন বুক দিয়ে কুঠিবাড়ি আগলে পড়ে আছ। গোঁজেরহাটের কে না তোমার কথা জানে বলো! না, না, এটা বিরুবাবুর ভারী কাঁচা কাজ হয়েছে। বিচক্ষণ হলে উনি তোমার কথাটা ওজন করে দেখতেন। শত হলেও বড়লোকের পুরনো বাড়ি বলে কথা। সোনাদানা, মোহর, হিরে, জহরত তো কম থাকার কথা নয়! কী বলো!"

গয়াবুড়ি ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আর বলিস না বাছা, এই দ্যাখ চাবির গোছা আঁচলের খুঁটে বেঁধে বয়ে বেড়াচ্ছি। কত ওজন জানিস? দেড় সের! চাবির বোঝা বইতে-বইতেই আমার পিঠ কুঁজো হয়ে গেল। তবু কি কৃতজ্ঞতা বলে কিছু আছে!"

"বড় মানুষদের ওইটেই দোষ কিনা, অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে চাঁদমারি। তোমাকে তো দেখছি উদয়াস্ত দৌড়ে বেড়াচ্ছ! হাঁফ ছাড়ার সময় নেই।"

ফোঁস! আবার একটা দীর্ঘশ্বাস। গয়াবুড়ির আজ দীর্ঘশ্বাসের গাদি লেগে গিয়েছে। ধরা গলায় বলে, "দুঃখের কথা আর বলিস না বাবা! এই নিয়েই আছি। তা হ্যাঁরে, তোর মুখটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন বল তো! কিছু খাসনি নাকি!"

গুণেন অবাক হয়ে বলে, "তাই তো! খাইনি নাকি? কাজে মজে থাকলে সব বিস্মরণ হয়ে যায় কিনা। তবে আবছা মনে পড়ছে দুপুরের দিকে যেন এক মুঠো ছাতু আর জল খেয়েছিলাম গো মাসি।"

"ওমা, তবে তো তোর খিদে পেয়েছে বাছা! দাঁড়া তো, সকালে যে লুচি আর মোহনভোগ হয়েছিল তার কয়েকখানা লুচি বোধহয় এখনও পড়ে আছে। যাই, নিয়ে আসি।"

হঠাৎ এ সময়ে গুণেন তার কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যেন কথাটা শুনতেই পায়নি।

গয়াবুড়ি কলাপাতায় মুড়ে খানদশেক লুচি আর এক থাবা মোহনভোগ এনে বলল, "নে বাছা, এটুকু মুখে দিয়ে একটু পিত্তদমন করে নে।"

গুণেন ভারী গদগদ হয়ে বলে, "মা-মাসিদের নিয়ে ওটাই অসুবিধে, বুঝলে মাসি! তাদের কাছে কিছু লুকোনো যায় না। মুখ দেখেই সব বুঝতে পেরে যায় কিনা।"

গয়াবুড়ির গলায় যেন আদর ঝরে পড়ছে। বলল, "খা বাবা, খা।"

তা খেল গুণেন। রসিয়ে-রসিয়েই খেল। রাজা-মহারাজাদের বাড়ির রান্নার বাহারই আলাদা। ঠান্ডা লুচি থেকেও গাওয়া ঘিয়ের সুবাস আসছে, আর মোহনভোগ মানে তো আর গরিবদের সুজি বা হালুয়া নয়, তাতে কাজু, কিসমিস, পেস্তা, কেশর, জায়ফল মিলেমিশে মারদাঙ্গা ব্যাপার। জিব থেকে পেট অবধি যেন আলো জ্বলে উঠল। আর চাবির গোছারও যে এমন সৌন্দর্য থাকতে পারে সেটাও এতদিন জানা ছিল না তার। গয়াবুড়ির আঁচলে বাঁধা এক থোলো চাবির দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে-চেয়ে তার যেন আশ মিটছিল না। বড়-বড় নিরেট চাবি সব। দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। এই সব চাবি দিয়ে যে সব দরজা বা সিন্দুক খোলা হয় সেগুলোকেও প্রণাম করতে ইচ্ছে যাচ্ছিল গুণেনের। তবে তাড়াহুড়োরও কিছু নেই। সবুরে মেওয়া ফলে। প্রণাম সময় সুযোগমতো করে আসা যাবে।

ঠিক এই সময়টায় কে যেন রসভঙ্গ ঘটাতে কাছেপিঠে থেকেই ভারী মিঠে গলায় বলল, "গয়াবুড়ি কি খাল কাটছ নাকি!"

গয়াবুড়ি মগ্ন হয়ে গুণেনের খাওয়া দেখছিল। বাহ্যজ্ঞান নেই বললেই চলে। তাই কথাটা খেয়াল করল না। কিন্তু গুণেনের তো তা নয়। তাকে নিজের গরজেই চারদিকটা খেয়াল রাখতে হয়। সে তটস্থ হয়ে এক গাল হেসে বলল, "উরে বাব্বা, রাখোহরিবাবু যে! তা বাবু, খবর-টবর সব ভাল তো?"

রাখোহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তোর খবর তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে।"

গয়াবুড়ি চটকা ভেঙে রাখোহরিকে দেখে বলে, "কিছু বলছিলি বাপু!"

"এই বলছিলুম, তুমি কি খাল কাটছ?"

"মরণ! খাল কাটব কেন রে?"

"কুমির ঢোকাবে বলে! আরও একটা কী যেন কথা আছে! ও হ্যাঁ, এ তো দেখছি কালসাপকে আদর করে বসিয়ে সাঁটিয়ে দুধকলা খাওয়াচ্ছ।"

গয়াবুড়ি ভারী চটে গিয়ে বলে, "ছিঃ ছিঃ! ও কী কথা রাখু, খিদের মুখে বেচারা একটু খাচ্ছে! ওরকম বলতে হয়!"

"বলি কি আর সাধে! দিনকাল ভাল নয়। ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে তো আমারই গর্দান নিয়ে টানাটানি! এ কি তোমার চেনা লোক?"

গয়াবুড়ি অম্লানবদনে বলে, "ও মা! চেনা নয় তো কী? এ হল আমার বোনপো।"

"তোমার তো তিন কুলে কেউ নেই বলেই জানি! হঠাৎ বোন এল কোত্থেকে? সেই সঙ্গে আবার একটা হদ্দমুদ্দো বোনপোও?"

"সে আছে বাছা, লতায়পাতায় সম্পর্ক, তবে ফ্যালনা নয়। তোর অত কথায় কাজ কী? নিজের কাজে যা না। তোকে দেখে বেচারির খাওয়াটাই চমকে গিয়েছে।"

"তা তো চমকানোরই কথা কিনা। শাকের আড়াল থেকে মাছ উঁকিঝুঁকি মারছে তো!"

"তুই লোককে বড্ড খুঁড়িস বাপু। সাতে নেই পাঁচে নেই, বেচারা সারাদিন মুখে রক্ত তুলে কল মেরামত করছে, অমনি খুঁত ধরতে শুরু করলি! এটা বাপু, তোর ভারী অন্যায়। মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দ্যাখ তো, কেমন বেচারা-বেচারা ভাব! একে কি চোরছ্যাঁচড় বলে মনে হয়!"

"মনে হচ্ছে, বোনপোকে পুষ্যি নিয়ে ফেলেছ!"

"আ মরণ! পুষ্যি নিতে যাব কেন রে? তবে গুণেনের উপর আমার একটু মায়া পড়ে গিয়েছে বাপু। যখন কথা কয় শুনে কান জুড়িয়ে যায়। বাক্যিতে যেন গুড় মাখানো! কথা কইতে ক'জন জানে বল তো! যাকে কইলি, কথা যদি তার গায়ে চিটে গুড়ের মতো লেগেই না রইল তবে তা কীসের কথা রে!"

রাখোহরি আঁশটে মুখে বলে, "অনেকে ওই গুড় বেচেই খায়, জানো তো! তা হলে গুড়েই মজেছ!"

গয়াবুড়ি একটা ঝামটা মেরে বলে, "মজেছি বেশ করেছি। এখন বিদেয় হ' তো। তোকে দেখে বেচারা বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছে।"

বাস্তবিকই গুণেন খাওয়া থামিয়ে লজ্জা-লজ্জা ভাব করে মিটিমিটি হাসছিল। সে জানে রাখোহরি কর্তাবাবুর পেয়ারের লোক। সে যে কাজ ফেলে লুচি-মোহনভোগ সাঁটাচ্ছে এ খবর রটতে কতক্ষণ। আর তাতে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে! তার মতো মানুষকে অনেক কথা মাথায় রেখে চলতে হয়।

রাখোহরি গুণেনের দিকে চেয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলে, "হ্যাঁরে গুণেন, কোন মন্তরে গয়াবুড়িকে বশ করলি বল তো! আমরা তো দিনরাত গয়াবুড়ির মুখনাড়া শুনে মরছি। বলি তান্ত্রিক ধরেছিস নাকি!"

গুণেন লজ্জায় অধোবদন হয়ে বলে, "কী যে বলেন রাখোবাবু, মাসির বাইরেটাই যা একটু শামুকের খোলার মতো শক্ত, মনটা বড্ড নরম। আমার মুখ শুকনো দেখে বড্ড বেজাহান হয়ে পড়লেন কিনা।"

"ওরে, চারদিকে কি শুকনো মুখের অভাব আছে? শুকনো মুখের তো আর আকাল পড়েনি! আজ অবধি কারও শুকনো মুখ দেখে গয়াবুড়িকে টসকাতে দেখিনি। তুই-ই প্রথম।"

রাখোহরি বিদেয় হলে গুণেন আবার ভারী মন দিয়ে লুচি-মোহনভোগ সাঁটাতে সাঁটাতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "এ বাড়িতে কি ভূত আছে মাসি?"

গয়াবুড়ি অবাক হয়ে বলে, "ভূত! ও মা, ভূত থাকবে কোন দুঃখে?"

গুণেনমিস্তিরি নির্বিকার গলায় বলে, "না, এই বলছিলুম, পুরনো বাড়ি তো, ইঁদুর, বাদুড়, ভূতেদের খুব সুবিধে। একটু স্যাঁতস্যাঁতে আর অন্ধকারমতো জায়গায় ওঁরা থাকেন ভাল। একটু ভ্যাপসা আর সোঁদা গন্ধ থাকলে তো কথাই নেই। দমচাপা ঘরদোর হলে তো আরও চমৎকার!"

"তোর কথা শুনে তো মনে হয় ভূতেদের সঙ্গে তোর নিত্যি ওঠাবসা! তা এ বাড়িতে তুই ভূতের কী দেখলি?"

"না, এই বলছিলাম আর কী, কাল যখন নতুন পাইপ বসাচ্ছিলাম, তখন তো সন্ধে নেমে গিয়েছে, তখন বেশ লম্বাচওড়া বাবুমতো লোক যেন ওই গাবগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমার কাজ দেখছিল। দিব্যি চেহারাখানা, মাঞ্জাও দিয়েছিলেন ভাল। চওড়া ধাক্কাপেড়ে ধুতি, গায়ে সুতোর কাজ করা গরদের পাঞ্জাবি, কাঁধে কাশ্মীরি চাদর। তা আমি বললুম, 'বাবু, দূরে দাঁড়িয়ে কেন, কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না কাছে এসে দেখে যান!' তা শুনে হঠাৎ বাবু ভুস করে উবে গেলেন।"

গয়াবুড়ি ভ্রূকুটি করে বলে, "মরণ! ও ভূত হতে যাবেন কোন দুঃখে রে? ও তো বড়কর্তা জন্মেজয় ভঞ্জ। কাল রাতে তো বড়কর্তাই এসে আমাকে তলব করে বলল, 'ওরে গয়া, নতুন মিস্তিরি লেগেছে দেখলাম। তা একটু নজর রাখিস বাপু। কে কোন মতলবে বাড়িতে ঢোকে তার ঠিক কী? তুই-ই আমার ভরসা, বিরুর তো কোনও হুঁশই নেই।' "

গুণেন মিস্তিরি মন দিয়ে কাজ করতে করতেই বলে, "পরশু দুপুরবেলা যখন খেটেখুটে একটু জিরোব বলে ওই শিমুল গাছটার নীচে বসেছি, তখন দেখি যেন ফস করে শূন্যি থেকে একটা দশ-বারো বছরের রোগাপানা মেয়ে বেরিয়ে এসে সজনে গাছটার তলায় এক্কাদোক্কা খেলতে লাগল। দেখে একটু অবাক হলুম, এ বাড়িতে এরকম বয়সের মেয়ের থাকার কথা নয়! তাই জিজ্ঞেস করলুম, 'ও মেয়ে, তোমার বাড়ি কোথা?' সে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসেই আচমকা ফের শূন্যির মধ্যেই ঢুকে গেল।"

"আর তুই বুঝি ধরে নিলি ভূত? দূর, ও তো সাতকড়ি পুরুতের মেয়ে লক্ষ্মী। সারাদিন বাড়িময় হুটোপাটি করে বেড়ায়!"

গুণেন হাতের কাজ থেকে মুখ না তুলেই বলে, "আমার কী মনে হয় জানো মাসি?"

"কী মনে হয় রে মুখপোড়া?"

"না, এই বলছিলুম যে, মানুষের বয়স বেশি হয়ে গেলে ওপারটাও দেখতে পায় কিনা, তাই বোধহয় এপার ওপার একাক্কার হয়ে যায়। এই তোমার যেমন হয়েছে গো মাসি।"

"ওরে অলপ্পেয়ে, তুই কি বলতে চাস আমার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে? নাকি আমি মতিচ্ছন্ন?"

"তাই বললুম নাকি!"

"তবে কী বললি রে হতভাগা?"

গুণেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, “ভাল কথাই বলছিলুম গো মাসি। বলছিলুম যে, তোমার চোখ খুলেছে। দূরদৃষ্টি এসে গেছে। বয়সকালে অনেকের হয়। তখন ইহলোক-পরলোক দুটোই দেখতে পায়। তাই বলছিলুম যে, ওতে একটা মুশকিলও হয় কিন্তু। দুটো লোক নিয়ে ভজঘট্ট পাকিয়ে যায় কিনা। এই তোমার যেমন হয়েছে। কথাটা কী খারাপ বললুম, তুমিই বলো।”

“কী জানি বাছা, তোর কথার প্যাঁচ আমি ধরতে পারছি না। তবে ভাল কথা বলেই মনে হচ্ছে যেন।”

“আমার একটা দোষ কী জানো মাসি, ভাল কথা ছাড়া অন্য কথা আমার মুখে আসতেই চায় না। অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, খারাপ কথা পেট পর্যন্ত আসে, কখনও-কখনও গলা অবধিও উঠে পড়ে, কিন্তু তারপর অনেক যুদ্ধ করেও তাদের গলার উপর তুলতে পারিনি। কী মনে হয় জানো? আমার গলায় বোধহয় একটা ছাঁকনি দিয়েই ভগবান পাঠিয়েছেন, তাতেই খারাপ কথাগুলো আটকে যায়। সেই জন্যই তো সারা জীবন কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদই হল না আমার। ঝগড়া লাগার আগেই কী করে যেন হেরে বসে থাকি।”

“ওরে বাবা! তা হলে তো তুই মিটমিটে ডান! অমন গুড় মাখানো কথা শুনেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল।”

গুণেন ভারী লজ্জার হাসি হেসে বলে, “তা এই বলছিলুম কী, গুড় মাখানো কথা কি খারাপ মাসি? কথা কইলুম, কিন্তু যাকে কইলুম তার গায়ে কথাটা যদি চিটেগুড়ের মতো লেপটেই না রইল তবে সে আর কীসের কথা! শুধু কথা কয়ে গেলেই কি হয়? তার কি আর কায়দা নেই? কথায় গুড় না মেশালে আঠা হয় না কিনা। হড়কে যায়।”

“ওম্মাগো, কোথায় যাব! তুই তো দেখছি ভারী বজ্জাত!”

গুণেনের ভাবখানা এমন যেন নিজের প্রশংসা শুনছে, লাজুক একটু হেসে বলে, “তা মাসি বলছিলুম কী, চারদিকে কি বজ্জাতের অভাব দেখছ?”

গয়াবুড়ি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “তা কথাটা বড় মন্দ বলিসনি বাছা। চারদিকে যেন বজ্জাতের হাট বসে গিয়েছে! যার সঙ্গে দেখা হয় সেই-ই বজ্জাত। দুনিয়াটা তবু কী করে চলছে তাই ভাবছি।”

॥ ৪ ॥

“এঃ হে! মেজবাবুর গজটা যে আমার ঘোড়ার মুখে পড়ে গেল! খেয়ে নেব যে!”

“খেয়ে নেবে মানে? খেলেই হল! তোমার ঘাড়ে ক'টা মাথা?”

“তা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু আপনার গজটা টুকটুকে একখানা পাকা ফলের মতো এমনভাবে নাকের ডগায় ঝুলে আছে যে, ইচ্ছে করছে কপ করে পেড়ে খেয়ে ফেলি!”

“লোভ সংবরণ করো কুঁড়োরাম। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।”

“তা না হয় করলাম। কিন্তু একটু আগে আপনার মন্ত্রীব্যাটাকে বাগে পেয়েও আপনার মুখ চেয়ে আমার নৌকোকে সংবরণ করতে হয়েছে। অবিশ্যি এরকম কাঁচা চাল তো আপনি হরদম দিয়েই থাকেন।”

“ওহে, পাকা খেলুড়িদের কাঁচা চালের মধ্যেও অনেক দুরূহ প্যাঁচ থাকে। ও তুমি বুঝবে না। কাঁচা চাল বলে মনে হয় বটে, কিন্তু ও হল ছদ্মবেশী চাল।”

“তা বটে। এখন এই বাঁ ধারের দ্বিতীয় বোড়েটা এক ঘর ঠেললেই কিন্তু আপনার একটা ঘোড়া যায়। তখন ঘোড়াটা না মারলে আপনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে যাবেন যে!”

“আহা, বোড়েটা তুমি ঠেলবেই বা কেন হে? তোমার কি চাল দেওয়ার মতো আর ঘুঁটি নেই?”

“তা থাকবে না কেন, বরং আপনিই বলে দিন আমি কোন ঘুঁটিটা চালব।”

“ঠিক আছে, তুমি বরং ডান ধারের তিন নম্বর বোড়েটা এগিয়ে দাও।”

“সেটা কি ভাল হবে মেজবাবু, তাতে আমার রাজা উদোম হয়ে যাবে যে!”

“তা বলে রাজাকে অত ঘেরাও করে রাখা কি ভাল? বায়ু চলাচলের পথটাও তো রাখতে হবে নাকি!”

“বায়ুর সঙ্গে-সঙ্গে আপনার মন্ত্রী আর গজেরও যে ঢুকে পড়ার রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে মেজবাবু!”

জন্মেজয় ভঞ্জ ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, “তোমার দোষ কী জানো কুঁড়োরাম, তুমি কিছু শিখতে চাও না।”

“কে বলে শিখতে চাই না! রোজই আমার বিস্তর শিক্ষা হচ্ছে তো! আপনাকে যত দেখছি তত শিখছি। তবে কিনা আজ আপনার চালগুলো বড্ড বেশি উচ্চাঙ্গের ছিল, তাই একটু হিমশিম খেতে হয়েছে বটে। আপনি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেজবাবু?”

“না হে, দীর্ঘশ্বাসটা ইচ্ছে করে ফেলিনি, তবে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল!”

“সচরাচর রাজাগজাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে না কিনা, তাই বললাম।”

“আজ আমার মনটা ভাল নেই হে কুঁড়োরাম।”

“বলেন কী মেজবাবু, রাজাগজাদের মন খারাপ হয় জন্মে শুনিনি। ওসব তো আমাদের হয়।”

"সে তো ঠিকই। মন-টনের মতো আজেবাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় কে! মনখারাপ জিনিসটা কেমন তাই তো আমার জানা ছিল না। কী হল জানো, এক জোছনা রাতে আসমানির চরে বসেছিলাম। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল। গাছপালায় একটা, ওই যে কী বলে, একটা মর্মরধ্বনি উঠছিল। ভারী শান্তি চারদিকে। ঠিক সেই সময়ে নিঃশব্দে একটা নৌকো এসে পাড়ে লাগল আর জনাপাঁচেক লোক নেমে এল। তাদের হাতে বন্দুক। একটু অবাক হলুম, এত রাতে এরা কী শিকার করতে এসেছে! বাঘটাঘ হলে অন্য কথা, কিন্তু আসমানির চরে তো বাঘভালুক নেই! একটু উদ্বেগও হল, কারণ ওরা হল আমারই প্রপৌত্র বিরু আর তার শিকারি বন্ধুরা। দেখলুম ওরা চোরের মতো চুপিচুপি হেঁটে মৃগদাবের দিকে যাচ্ছে। গোকুলেশ্বরের মৃগদাবের কথা তো তুমি নিশ্চয়ই জানো কুঁড়োরাম!"

"জানি মেজবাবু।"

"সবাই জানে গোকুলেশ্বরের প্রাণ হল তার হরিণেরা। অনেক কষ্টে, অনেক খুঁজে সে নানা জাতের চল্লিশ-পঞ্চাশটা হরিণ জোগাড় করে এনে সেগুলোকে মায়ের মতো যত্নে পালে-পোষে। নানা গাছপালায় সাজানো তার মৃগদাবে গেলে চোখ আর মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়। দশ-বারোজন লোক দিনরাত হরিণের পরিচর্যা করে। প্রতি সপ্তাহে পশুচিকিৎসক এসে হরিণদের চিকিৎসা করে যায়। দেখলুম, শিকারিরা ওই মৃগদাবের দিকেই যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটা খুব ভাল মনে হল না আমার। সেদিন গোকুলেশ্বর আর তার পাঁচজন লোক নতুন হরিণের সন্ধানে নফরগঞ্জে গিয়েছিল। ফলে মৃগদাবে লোক ছিল খুব কম। বুঝলুম শিকারিরা সব খবর নিয়েই এসেছে। বুঝলে কুঁড়োরাম, সেই রাতেই জীবনে আমি প্রথম দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সেই প্রথম টের পেলাম দীর্ঘশ্বাস কাকে বলে।"

"বুঝলুম। আমাদের অবশ্য দীর্ঘশ্বাসের কোনও অনটন নেই। তারপর কী হল বলুন।"

"তারপর দুটো বন্দুকের আওয়াজ হল। একটু বাদে শিকারিরা দুটো হরিণের লাশ বালির উপর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে এনে নৌকোয় তুলল। গোকুলেশ্বরের লোকেরা অবশ্য তাড়া করে এসেছিল, কিন্তু শিকারিরা ফায়ার করায় তারা আর এগোয়নি।"

"সেই থেকেই কি আপনার মন খারাপ মেজবাবু?"

"জীবনে সেই প্রথম মনখারাপের অভিজ্ঞতা হল, বুঝলে কুঁড়োরাম! দুনিয়াতে কাপুরুষ অনেক আছে জানি, কিন্তু তাদের একটা যে আমারই বংশধর, সেটা জানলে বড্ড জ্বালা হয় হে!"

কুঁড়োরাম মিইয়ে গিয়ে বললেন, "আমরা বংশানুক্রমে কাপুরুষ বটি, তবে আপনার জ্বালাটাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। তারপর কী হল?"

"এ তল্লাটের বাচ্চা ছেলেটাও জানে, গোকুলেশ্বর ডাকাত ছিল। ভয়ংকর ডাকাত। তার নামে সাতটা খুনের মামলা ঝুলছে। তার মতো নৃশংস লোক দুটো ছিল না। সারেন্ডার করাতে সরকার বাহাদুর তাকে ক্ষমা করে দেন। এখন সে তার শাকরেদদের নিয়ে মৃগদাবেই থাকে। গত দশ বছর তার নামে কোনও নালিশ হয়নি। হরিণ নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। তার ধ্যানজ্ঞান ওই মৃগদাব।"

"এ তো সবাই জানে। কিন্তু হরিণদুটোকে বিরুবাবু মারলেন কেন?"

"সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। তবে কানাঘুষো শুনছি, বাবুরা নাকি আসমানির চরে গিয়ে সারাদিন বন্দুক ফোটাত বলে গোকুলের কোনও এক স্যাঙাত নাকি আপত্তি জানিয়েছিল। বলেছিল, 'আসমানির চরে শিকার

করা বারণ। হরিণেরা ভয় পাচ্ছে।' কথাটা মিথ্যেও নয়। তাতেই হয়তো বাবুদের মানহানি হয়ে থাকবে। তা বলে হরিণ মেরে কেউ প্রতিশোধ নেয়? হরিণের মাংস খেয়েছ কখনও? খুব একটা সুস্বাদু নয়, রান্নারও ঝামেলা আছে। শিকারিরা হরিণদুটোর ছাল ছাড়িয়ে টুকরো করে দু'দিন ধরে পেঁপের রস আর দুধে ভিজিয়ে রেখে মজিয়ে নিয়ে তারপর রান্না করে বিশাল ভোজ খেয়েছে। কেন রে বাপু, দেশে খাসি বা পাঁঠার কি আকাল পড়েছিল যে, গোকুলের দুটো হরিণকে মারতে হল! আর গোকুলেশ্বরই কি ছেড়ে কথা কইবে ভেবেছ?''

"তা গোকুলেশ্বর কি কোনও হুমকি-টুমকি দিয়েছে নাকি মেজবাবু?''

"না, দেয়নি। আর সেটাই আরও চিন্তার কথা, বুঝলে? নফরগঞ্জ থেকে আরও সতেরোটা হরিণ এনেছে সে। ফিরে এসে ঘটনাটা শুনেছে। শুনে একটাও শব্দ করেনি। চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ করে ছিল। তারপর বেরিয়ে এসে রোজকার মতোই হরিণদের দেখভাল করে যাচ্ছে। যেন কোনও হেলদোলই নেই। কিন্তু আমার চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। আমি লক্ষ করছি, তার চোখদুটো হঠাৎ একদম পালটে গিয়েছে। কোনও হুমকি নেই, আস্ফালন নেই, চেঁচামেচি নেই, পুলিশের কাছে নালিশ অবধি করেনি। তাই বড় ভয় হচ্ছে হে কুঁড়োরাম!''

"ভয়! আপনারও ভয় হয় মেজবাবু! ভয়টয় তো এই আমাদের মতো মনিষ্যিদের জন্য।''

"তাও বটে। ভয় জিনিসটা কেমন সেটা কখনও টেরই পাইনি কিনা। তাই যখন প্রথম ভয়টা মনে এল, তখন ভারী অসোয়াস্তি, আইঢাই, উদগার, জৃম্ভণ, আরও কী সব যেন হচ্ছিল।''

"কিন্তু শরীর না থাকলে এসব তো হওয়ার কথা নয় মেজবাবু!''

"তাও বটে! কিন্তু হচ্ছিল হে! ঠিক বোঝাতে পারব না। যে শত্রু চোখ রাঙায় না, তর্জন-গর্জন ছাড়ে না, লাফঝাঁপ করে না, কিন্তু চুপচাপ নিজের মনে হিসেব কষে যায়, তার মতো বিপজ্জনক শত্রু কেউ নয়।''

"কিন্তু গোকুলেশ্বর কী চায়, তা কি আন্দাজ করা গিয়েছে?''

মাথা নেড়ে জন্মেজয় বলেন, "না হে, তবে বিরু যে কিছু আন্দাজ করেছে, তা টের পাচ্ছি। কারণ, সে একজন বডিগার্ড মোতায়েন করেছে। বেশ শক্তপোক্ত বডিগার্ড, তার নাম ভুসিরাম। সে খবর পেয়েছে যে, গোকুলেশ্বরের লোকেরা নানা ভেক ধরে আশপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। তাদের সকলেরই নাম 'গ' দিয়ে শুরু। কী যে হবে কে জানে! আমার বংশটাই না লোপাট হয়ে যায়!''

খুব চিন্তিত মুখে একটু রাত করেই বাড়ি ফিরছিলেন কুঁড়োরাম। বেশ জোছনা ফুটেছে আজ। মাঠঘাট সব বেশ স্পষ্ট ঠাহর হচ্ছে। শিরশিরে একটা হাওয়া বইছে। কুলতলির মাঠটা পেরোলেই বাড়ি আর পোটাক রাস্তা। দিব্যদৃষ্টিটা হওয়ার পর থেকে আজকাল খুব সুবিধে হয়ে গিয়েছে। সবই দেখতে পান। যেমন এখন তিনি মাঠের মধ্যিখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দিব্যি দেখতে পাচ্ছেন আশপাশে সামনে পিছনে ছোট-ছোট পরি উড়ে বেড়াচ্ছে, বেলুনের মতো গোল-গোল কয়েকটা মানুষ ঘাসের উপর খানিক হেঁটে, খানিক গড়িয়ে ঘুরে ঘুরে কী করছে কে জানে, ওই যে লম্বা লিকলিকে একটা লোক হঠাৎ হুস করে মাঠটা কোনাকুনি পার হয়ে কোথায় যেন চলে গেল। ছোট-ছোট মেঘের টুকরো পেঁজা তুলোর মতো ইতিউতি পড়ে আছে। লোককে বললে বিশ্বাস করতে চায় না বটে, কিন্তু তিনি যে এসব জলজ্যান্ত দেখছেন, তা তো আর মিছে নয়! সেদিন মেজবাবুকেও বলতে গিয়েছিলেন, তাতে জন্মেজয় ভঞ্জ খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "আমার আগে তোমার দিব্যদৃষ্টি

হয় কী করে হে? তুমি তো আমার প্রজা! কখনও শুনেছ রাজার আগে প্রজার দিব্যদৃষ্টি ফুটেছে? সব জিনিসেরই তো একটা নিয়ম আছে নাকি!" কুঁড়োরামকে চুপ মেরে যেতে হল।

এ সময় হঠাৎ একেবারে কান ঘেঁষে কে যেন মোলায়েম গলায় বলে উঠল, "বুড়োকর্তা, কাজটা কি আপনি ঠিক করলেন?"

কুঁড়োরাম আঁতকে উঠে বললেন, "কে রে?"

"আজ্ঞে, আমি গন্ধেশ্বর।"

ভারী অবাক হয়ে কুঁড়োরাম বলেন, "গন্ধেশ্বর!"

"যে আজ্ঞে। ছাগলের ব্যাপারী গন্ধেশ্বর। মনে নেই আমাকে?"

কুঁড়োরাম উত্তেজিত হয়ে বলেন, "মনে থাকবে না মানে! মনে না থেকে উপায় আছে? কিন্তু তোমার এমন ব্যবহার কেন বলো তো! মানছি তুমি একজন জ্ঞানী লোক, ছাগলের ব্যাপারে তোমার মতো এত পণ্ডিত কেউ নয়। এটাও না মেনে উপায় নেই যে তোমার তৃতীয় নয়নও ফুটেছে, কিন্তু তা বলে আমার গোপন তবিল হাপিস করা কি তোমার উচিত হল বাপু?"

গন্ধেশ্বর অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বলে, "কথাটা কইতে আপনার বাধল না বুড়োকর্তা! ছিঃ ছিঃ, ভাবলে আমারই তো মাথা হেঁট হয়ে আসে! আপনার মতো একজন মানুষ যে একাজ করতে পারেন সেটা বিশ্বাসই হতে চায় না মশাই!"

কুঁড়োরাম ভড়কে গিয়ে বলেন, "তার মানে? আমি আবার কী করলাম হে?"

"সেই বৃত্তান্ত বলতেই তো আসা। আপনার তবিল চুরি হয়েছে বলে আপনার ছেলেরা পুলিশে এত্তেলা দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ এসে খোঁজখবর করাতে বুড়োকর্ত্রী বেরিয়ে এসে বললেন, 'বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। ও তবিল আমি কবেই সরিয়ে ফেলেছি। গয়নাগুলো তিন বউমাকে বাঁটোয়ারা করে দিয়েছি, আর টাকাগুলো সংসারের কাজে লাগছে। ওই গর্তের মধ্যে পড়ে থাকলে হয় চুরি হয়ে যেত, নয়তো টাকাগুলো পোকায় কাটত। ওখানে পাঁচটা টাকা শুধু পড়ে আছে।' তাই বলছিলুম এই গরিবকে এত মেহনতের মধ্যে ফেলা কি আপনার ধর্মে সইবে? খাটুনির মজুরিটা অবধি ওঠেনি!"

কুঁড়োরাম একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, "তাই তো হে, তা হলে তো তোমার খুব হয়রানি গিয়েছে! তা বাপু, তুমি কি চোর নাকি?"

"চোর! কীসের চোর! কোথায় চোর? কে চোর? চোরের কথা উঠছে কেন বলুন তো! এর মধ্যে চুরির আপনি কী দেখলেন বুড়োকর্তা?"

"তা হলে কি তুমি বলতে চাও যে তুমি চোর নও?"

"আমি! হাসালেন বুড়োকর্তা! ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে, নইলে বলতে হয়, চোর তো বেরোলেন বুড়োকর্ত্রী! আর আমি! আমি তো আপনার ভাল ভেবে মনে করলাম, বুড়োকর্তার তো বয়স হয়েছে, তাঁর তবিলের দেখাশোনা করাটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। চারদিকে চোর-ছ্যাঁচড়ের যা উপদ্রব! তাই তবিল সব ঠিকঠাক আছে কি না তা দেখার জন্য রাতবিরেতে কত কষ্ট করে, আপনার কাঁচা ঘুম বাঁচিয়ে, আপনার ছাগলদের সামলে ঠাকুরের সিংহাসন সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি, সব ফক্কা। একখানা পাঁচ টাকার চাক্কি পড়ে

আছে শুধু। ছিঃ ছিঃ বুড়োকর্তা, এভাবে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া কি আপনার উচিত কাজ হল? এর পর পাঁচজনকে মুখ দেখাবেন কী করে?"

এই বলেই গন্ধেশ্বর হনহন করে হেঁটে হাওয়া হয়ে গেল। বেশ অভিমান করেই চলে গেল বলে মনে হয়।

অপ্রস্তুত কুঁড়োরাম নিজের থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবতে লাগলেন, তাই তো! এসব হচ্ছেটা কী? কোথায় যেন একটা গড়বড় হয়ে যাচ্ছে! এ তো মোটেই ভাল কথা নয়! এত ভুলভাল করার লোক তো তিনি নন! ম্যাট্রিকে তিনি পাঁচটা লেটার পেয়েছিলেন, নিন্দুকেরা স্বীকার করুক বা না করুক, তাঁর মেধা তো আর কারও চেয়ে কম নয়! তবে ভুল হচ্ছে কী করে? 'বাচস্পতি' উপাধি তো তাঁকে মুখ দেখে দেয়নি। হুঁ হুঁ বাবা, বিস্তর শাস্ত্র ঘেঁটে তবে বাচস্পতি হওয়া যায়। অঙ্কে নম্বরটা একটু কম হয়েছিল ঠিকই, আর ইংরেজি তো ম্লেচ্ছ ভাষা, তাই সেই বাবদে নম্বরটা তিনি ধরছেন না। আর কীসে তিনি কম? এসব ভেবে নিজের উপর তো এখন তাঁর শ্রদ্ধাই হচ্ছে! নিজেকে একটা প্রণাম করতেও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু এই বয়সে অতটা ঝুঁকে নিজের পায়ের ধুলো নেওয়া ভারী শক্ত কাজ। একবার ঝুঁকলে পিঠ ব্যাটা আর সোজাই হতে চায় না। গত বোশেখ মাসে তো সেই বিপদই হয়েছিল। সক্কালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, না, আজ একটা শুভদিন, আজকের দিনটা একজন বিচক্ষণ, সজ্জন, শাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষিত, দূরদ্রষ্টা, সমদর্শী, নিরহংকার, দয়ালু, উদারচেতা, অকুতোভয়, মোহমুক্ত, নির্লোভ, বিগতস্পৃহ, দেবতুল্য মানুষকে প্রণাম করে শুরু করা উচিত। কিন্তু বসে বসে আকাশপাতাল ভেবেও এমনতরো কাউকে মনে করতে পারলেন না। ঘণ্টাখানেক বাদে মনে হল, একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই এমনতরো নেই। নিজেকে প্রণাম করতে একটু বাধো বাধো ঠেকছিল বটে, কিন্তু উপায়ই বা কী? আর সেইটে করতে গিয়ে সেই যে কুঁজো হলেন, পরের তিন দিন সবাই মিলে নানা রকম ডলাইমলাই করা সত্ত্বেও, আর সোজা হতে পারেননি। সেই থেকে নিজের উপর শ্রদ্ধাভক্তির বাড়াবাড়ি রকমের ভাব এসে গেলে নিজেকে সামলে রাখতে হয়। আজও সামলানোর চেষ্টা করছিলেন।

হঠাৎ কাছ থেকেই কে যেন ফস করে বলে বসল, "এই যে বাচস্পতিমশাই! তা এই ভরসন্ধেবেলা কুলতলির মাঠে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বলুন তো! মতলবটা কী! একটু আগেই তো আড়াল থেকে দেখলাম বলুগুন্ডাটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে খোসগল্প জুড়ে দিয়েছেন, দেখে মনে হচ্ছিল দু'জনের ভারী ভাবসাব। কী ব্যাপার মশাই, কোনও ফন্দি আঁটছেন নাকি? রকমসকম তো তেমন সুবিধের ঠেকছে না!"

এই বাক্য শুনে কুঁড়োরামের বাক্য হরে গেল, হাঁ করে লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না। লম্বা চওড়া লোক, দিব্যি জোয়ান তাগড়াই চেহারা, চোখে খর দৃষ্টি, মাথায় কদমছাঁট চুল, গায়ে ময়লা পিরান আর পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি। বাক্য ফিরে পেতে খানিক সময় লাগল কুঁড়োরামের। তারপর ভয়ে ভয়ে বললেন, "না বাবা, মতলব কিছু খারাপ নয়। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি কিনা, তাই ঠাহর করবার চেষ্টা করছিলাম আর কী।"

লোকটা গুল্লুগুল্লু চোখে তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে বলে, "ওসব ভীমরতির গল্প আমাকে বলে লাভ হবে না। আপনি যে একজন জাঁহাবাজ লোক, তা আমরা জানি। বলুগুন্ডার সঙ্গে যে আপনার মেলামেশা, দহরম-মহরম আছে, সে খবরও আমাদের অজানা নেই। আর কুঠিবাড়ির কাছারিঘরে প্রায়ই কারও সঙ্গে আপনাকে গোপনে শলাপরামর্শ করতে দেখা যায় বলেও খবর আছে। আজও আপনি সেখানে গিয়েছিলেন।"

কুঁড়োরাম ফের বাক্য হারিয়ে ফেললেন এবং বেশ কিছুক্ষণ কোনও ভাল বা মন্দ বাক্য খুঁজেই পেলেন না। অনেক কষ্টে শেষে বললেন, "তা বাবা, বুড়োমানুষ তো, ভুলভাল করে ফেলি। ক্ষ্যামাঘেন্না করে দাও। আমি বরং তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। এবার আমি তবে আসি?"

লোকটা বাঘা চোখে চেয়ে একটা হুংকার দিল,"আশীর্বাদ! কে আপনার আশীর্বাদ চেয়েছে শুনি! পট করে একটা আশীর্বাদ করে ফেললেই হল! এর পর তো হাটে-মাঠে-ঘাটে হ্যাতান্যাতা যে কেউ আশীর্বাদ করার জন্য তেড়ে আসবে! আশীর্বাদ করারও মুরোদ চাই মশাই। যারা ষণ্ডাগুন্ডাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে, যাদের গতিবিধি সন্দেহজনক, যারা ভদ্রলোকের পোশাক পরে নানা দুষ্কর্মের ইন্ধন জোগায়, তাদের আশীর্বাদ অভিশাপের চেয়েও খারাপ।"

হুংকার শুনে ভয়ে আরও একটু জড়সড় হয়ে গেলেন কুঁড়োরাম, গলাটাও কেমন যেন ফেঁসে গেল, ভিতর থেকে আওয়াজই বের করতে পারছিলেন না। অতি কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে বাবা! আশীর্বাদ করাটা মোটেই উচিত কাজ হয়নি।"

লোকটা কুঁড়োরামকে ভস্ম করে দেওয়ার চোখে তাকিয়ে বলে, "বলুগুন্ডাটা কী বলে গেল আপনাকে শুনি!"

কুঁড়োরাম আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "বলুগুন্ডা! না বাবা, বলুগুন্ডার সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি! আমার সঙ্গে তো গন্ধেশ্বরের কথা হচ্ছিল।"

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বাঘা গলায় বলে, "চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। গত দু'বছর ধরে আমি বলুর পিছু ধাওয়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাকে এক মাইল দূর থেকেও চিনতে পারি। সে একজন স্মাগলার, সুপারি খুনি, আড়কাঠি, জালিয়াত, তোলাবাজ এবং কী নয়! আপনি সেই বলুকে বাঁচাতে একজন বাচস্পতি হয়েও মুখ মুছে মিছে কথা বলতে পারলেন? আপনার লজ্জা করল না?"

কুঁড়োরাম আমতা-আমতা করে বললেন, "তা লজ্জা একটু করছে বটে, বাবা! তা হলে কি বলছ বলুগুন্ডাকে আমার চেনা উচিত?"

লোকটা এবার একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, "চেনা উচিত কী বলছেন,আমার তো মনে হচ্ছে আপনি তার সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছেন! ঠিক কি না? আর কুঠিবাড়ির কাছারিঘরে কার সঙ্গে আপনার মেলামেশা হয়, সেটাও আমাদের জানা দরকার। এবার ঝেড়ে কাশুন তো!"

কুঁড়োরাম সভয়ে বললেন, "আমার যে বড় শ্লেষ্মার ধাত, একবার কাশলে সেই কাশি আর থামতেই চায় না! তা কাশব কি বাবা?"

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, "থাক, আর কাশির দরকার নেই। এবার বাড়ি যান। মনে রাখবেন আবার বলুগুন্ডার সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। আর কাছারিঘরের উপরেও আমরা নজর রাখছি।"

কুঁড়োরাম সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বলেন, "সে আর বলতে! তাই হবে বাবা!"

মানুষ ভাবে এক আর হয় আর-এক। কুঁড়োরাম কুলতলির মাঠে মারমুখো লোকটার কাছে যথেচ্ছ হেনস্থা হয়ে বাড়ি ফিরে কম্পিতবক্ষে স্থির করে ফেললেন, না, আর গন্ধেশ্বরের মুখদর্শনও করবেন না। মেজবাবুর সঙ্গেও আর দেখাসাক্ষাতের দরকার নেই। রাতে তিনি খাটের পাশের জানালাটা কটকটে করে এঁটে শুলেন। কিন্তু বড্ড ধকল গিয়েছে বলে বায়ু কুপিত হয়ে ঘুম আসছিল না। এপাশ-ওপাশ করছেন, এমন সময়, নিশুত রাতই হবে, জানালার বাইরে থেকে মোলায়েম গলায় কে যেন বলল, "বুড়োকর্তার কি আজ ঘুম আসছে না নাকি! বড্ড নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি যে!"

কুঁড়োরাম গলাটা বিলক্ষণ চেনেন। গন্ধেশ্বর। কিন্তু না চেনবার চেষ্টা করতে করতে মটকা মেরে শুয়ে রইলেন। নড়াচড়া বন্ধ। মোলায়েম গলা আবার বলে, "বুড়োকর্তা দেখছি টোকনার ঠোকনা খেয়ে বড্ড লাতন হয়ে পড়েছেন! আরে দূর-দূর! আপনিও যেমন, টোকনা আবার একটা ভাবনার বিষয় হল? শূন্য কলসি বাজে বেশি। আপনি উলটে চোখ রাঙালেই দেখতেন পালানোর পথ পাচ্ছে না।"

এবার কুঁড়োরাম উঠে বসে খুব অভিমানের গলায় বললেন, "বাপু, তুমি তো গন্ধেশ্বর নও। তুমি তো বলুগুন্ডা। তা কথাটা আগে বলতে হয়!"

"বলেন কী কর্তা, আমি গন্ধেশ্বর নই? সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জেনে আসছি যে আমার নাম গন্ধেশ্বর, ডাকনাম গ্যাদা, সেটা কি তবে মিথ্যে? আমার নাম বলুগুন্ডা একথা কি ওই মিথ্যেবাদী টোকনা

আপনাকে বলেছে? ও যদি দশটা কথা কয় তা হলে তার মধ্যে এগারোটা মিছে কথা থাকে। খগেন মালকে কি আর আজ চিনলাম বুড়োকর্তা! ভালমানুষ সেজে বিরুবাবুর বন্ধু হয়ে কুঠিবাড়িতে ঢুকেছে বটে, কিন্তু ওর মতলব কী সে তো আমি জানি!"

"কী মতলব বাপু?"

"সে আর আপনার জেনে কাজ নেই। আপনি ঋষিতুল্য লোক, পাপীতাপীদের কথা যত না শোনেন ততই ভাল। তবে জেনে রাখুন, খগেনের কাছ থেকে যত দূরে থাকবেন ততই মঙ্গল। ওর হাওয়া-বাতাসও পারতপক্ষে গায়ে লাগাবেন না। টোকনা ভদ্রলোক সেজে আজ খগেন মাল হয়েছে বটে, কিন্তু চরিত্তির যাবে কোথা? কুঠিবাড়ির কোথায় সোনাদানা, হিরেজহরত লুকনো আছে তারই গন্ধে-গন্ধে এসে জুটেছে। আপনার উপরে চড়াও হয়েছিল তো সেই কারণেই।"

কুঁড়োরাম ভারী অবাক হয়ে বলেন, "কী কারণে বাপু? এর মধ্যে আমি আসছি কোত্থেকে?"

আড়ালে খুক করে একটু হাসি শোনা গেল গন্ধেশ্বরের। তারপর গলাটা এক পরদা নামিয়ে বলে, "আসছেন বুড়োকর্তা, আপনিও আসছেন।"

"বলো কী? আমি কীভাবে আসতে পারি?"

"তা এই ধরুন আপনি একজন ব্রেহ্মজ্ঞানী মানুষ তো বটে! লোকে বলাবলি করে আপনি জপতপ করতে করতে খুব উঁচু থাকে উঠে গিয়েছেন। তারা এমন কথাও বলে যে, কুঁড়োঠাকুর এখন সামনে পিছনে ভূত নিয়ে চলাফেরা করেন। রাস্তায়ঘাটে, বাজারেহাটে, আপনাকে নিয়ে খুব কথা হচ্ছে আজকাল। তারা বলে, কুঠিবাড়ির মেজকর্তার সঙ্গে কুঁড়োঠাকুরের সাঁট হয়েছে। দু'জনে এখন হরিহরাত্মা। লুকানো সোনাদানার বিলিব্যবস্থা এখন কুঁড়োঠাকুরের হাতে। পাপীতাপীরা একথা শুনে ভারী তেতে উঠেছে কিনা। আপনি তো আপনভোলা লোক তাই হয়তো খেয়াল করেন না যে, আপনি পথে বেরোলেই কিছু লোক আপনার পিছু নেয়। কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে কথা কইছেন, সব তারা হিসেবে রাখছে। তাতে একটা সুবিধেও হয়েছে কিন্তু, আপনাকে আর একাবোকা চলাফেরা করতে হচ্ছে না। এই বয়সে সেটাও একটা ভরসা, কী বলেন?"

এখন ভাদ্রের শেষ। একটুআধটু হিম পড়ে আজকাল। তা সত্ত্বেও কুঁড়োরামের এখন বেশ ঘাম হতে লেগেছে। তিনি ফাঁসা গলায় বললেন, "এটা কি তাদের উচিত হচ্ছে গন্ধেশ্বর? কারও পিছু নেওয়া কি ভাল?"

"শুধু পিছু নেওয়া কী বলছেন, আপনার বাড়ির চারদিকেই তারা প্রায় সবসময়ে চক্কর কাটছে। এই তো একটু আগেই দেখলুম, লম্বা গলার শুঁটকো একটা লোক আপনার জানলার পাশটিতে বেশ কিছুক্ষণ থানা গেড়ে ছিল। সে বিদেয় হল তো একজন দশাসই চেহারার লোক কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। সে ফিরে যাওয়ার পর একজন বেঁটে মোটা লোকও হাফপেন্টুল পরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে গিয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে তল্লাটে আপনার খাতির বড্ড বেড়ে গিয়েছে কর্তা!"

কিন্তু এ খবরে কুঁড়োরামের তেমন আনন্দ হল না, বরং তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, "বাপু গন্ধেশ্বর, বাকি রাতটা দেখছি আর ঘুমের আশা নেই! এইভাবে আমাকে উদ্বেগে ফেলে দেওয়া কি ঠিক হল হে!"

"আজ্ঞে কর্তা, কাঁঠাল পাকলে ভোমা মাছিরা তো আসবেই! ওটাই নিয়ম কিনা! আর এই তক্কে খুব নামডাকও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনার। সেটাও তো কম কথা নয়!"

নামডাক হচ্ছে শুনে বরং কুঁড়োরামের গলা আরও শুকিয়ে গেল। তিনি প্রায় এক ঘটি জল খেয়ে ফেললেন, তারপর দুর্গতিনাশিনীর জপ করতে করতে চোখ বুজলেন। জানালার বাইরে থেকে গন্ধেশ্বর বলল, "আজ মনে হচ্ছে আপনার ঊর্ধ্বগামী বায়ু আর নীচে নামবে না। তা হলে বরং পরে কখনও এসে শ্রীচরণে কয়েকটা কথা নিবেদন করে যাব।"

সকালে শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য এবং জপতপ সেরেই কুঁড়োরাম হাঁক মারলেন, "কাশীম! কাশীম আছ নাকি হে!"

ডাক শুনে আজ তাঁর বড় ছেলে মনসারাম এসে দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, "বাবামশাই, ডাকছিলেন নাকি?"

কুঁড়োরাম বললেন, "ওহে, আমি ঠিক করেছি কিছুদিন কাশীতে গিয়ে থাকব। তোমরা তার ব্যবস্থা করো।"

মনসারাম প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, "বলেন কী বাবামশাই? চারদিকটা ম্লেচ্ছকণ্টকিত বলে আপনি কখনও এই পরগনার বাইরে যাননি, গোগাড়ি ছাড়া আর কোনও যানবাহনের সঙ্গে আপনার সংস্রব নেই, কখনও রেলগাড়িতে চাপেননি, তার উপর এই বয়সে কাশীযাত্রা কি আপনার সইবে?"

কুঁড়োরাম বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওহে, এই জায়গাও আমার ঠিক সহ্য হচ্ছে না। অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়েছে। কাশীতে গিয়ে একটু হাঁফ ছাড়া দরকার।"

"তা হলে কাশীতে যাওয়ার আগে একবার কোবরেজমশাইকে দেখালে হয় না? কাশীতে গেলেই তো উপসর্গগুলোর উপশম হবে না! তার জন্য চিকিৎসা দরকার। তা ছাড়া আরও অসুবিধে আছে। রেলগাড়িতে নানা লোকের ভিড়। আপনি জপতপ, আচারবিচার সামলে এত দূর যেতে পারবেন কি?"

কুঁড়োরামও বুঝতে পারছিলেন সিদ্ধান্তটার মধ্যে একটা গোলমাল রয়েছে। তবু মুখে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "তোমাদের দোষ কী জানো, তোমরা সব কথাতেই ফুট কাটো! ভোরবেলা উঠেই আমার মনটা তখন থেকে কাশী-কাশী করছে, সেটাও তোমাদের সহ্য হচ্ছে না! আরে বাপু তীর্থধর্মও তো করা দরকার, নাকি?"

"আজ্ঞে তা তো বটেই, তবে বয়সের কথাটা বিবেচনা করলে হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়াটা উচিত হবে না। আপনি বরং মায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে দেখুন।"

কুঁড়োরাম ফুস করে নিবে গিয়ে জুলজুল করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তা হলে বরং কাশী এখন থাক। কী বলো? আচ্ছা বৃন্দাবনটা কি একটু কাছাকাছি হবে? তা হলে তুমি বরং আমার জন্য বৃন্দাবনের একটা টিকিট কেটে নিয়ে এসো।"

"না বাবামশাই, বৃন্দাবন আরও দূরে।"

"নাকি! তা হলে বরং হরিদ্বারের ব্যবস্থাই করো। সেটা তো আর দূরে নয়!"

"হরিদ্বার কাশী ছাড়িয়ে। কিন্তু আপনি হঠাৎ তীর্থে যাওয়ার জন্য উতলাই বা হয়েছেন কেন বাবামশাই?"

কুঁড়োরাম এ কথার জবাব দিলেন না। জুলজুল করে চেয়ে রইলেন। সন্ধেবেলা তাঁকে দেখে জন্মেজয় ভঞ্জ বোমার মতো ফেটে পড়ে বললেন, "তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় হে কুঁড়োরাম! আমি জীবনে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার যেতে পারিনি, আর আমার আগে তুমি সেখানে যাওয়ার কথা ভাবলে কী করে? তুমি না আমার প্রজা! রাজার আগে প্রজা তীর্থ করতে যায় কখনও শুনেছ?"

॥ ৫ ॥

"আপনার কুকুরদুটো কিন্তু খুব গম্ভীর মশাই। ঘেউঘেউ করতে শুনলুম না তো!"

"এরা কাজের লোক, বেশি সাড়াশব্দ করতে পছন্দ করে না।"

"কামড়ে-টামড়ে দেয়?"

"না, সহজে কামড়ায় না। তবে দরকার হলে লাফিয়ে উঠে গলার নলি ছিঁড়ে দেয়।"

"ও বাবা! ডেনজারাস কুকুর মশাই! ঘেউঘেউ করে না, লাফিয়ে উঠে গলার নলি ছিঁড়ে দেয়! ও মশাই, এরা সত্যিকারের কুকুর তো! নাকি অন্য কিছু?"

"এরা শিকারি কুকুর।"

"শিকারি কুকুর? বাঘের সঙ্গে পারবে?"

"তা হয়তো পারবে না। কারণ বাঘের গায়ে জোর বেশি। তবে বাঘের সামনে পড়লে পালাবেও না। শেষ অবধি লড়বে।"

কোদণ্ড গজপতি পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেননি কেন? ওরকম বিপজ্জনক কুকুরকে বেঁধে রাখাই তো উচিত।"

"ভয় পাবেন না। এই যে আমার চেয়ারের দু'পাশে চুপটি করে বসে আছে, আমি না বললে নড়বেও না।"

"তবু একটু ভয়-ভয় করছে মশাই! যেভাবে তাকাচ্ছে তাতে বুকটা গুড়গুড় করে উঠছে মাঝে-মাঝে।"

"ভয় পাওয়া ভাল। যারা ভয় পায় না তাদের এরা সন্দেহের চোখে দেখে।"

"ও বাবা! তা হলে ওদের বলে দিন যে,আমি ওদের খুব ভয় পাচ্ছি।

"বলতে হবে না। ওরা নিজেরাই বুঝতে পারে। এবার আমার কেসটা কী হল বলুন।"

"হ্যাঁ, সেই কথা বলতেই আসা। আসমানির চর একসময়ে আপনাদেরই সম্পত্তি ছিল বটে। কিন্তু সেটা কুশি নদীর জলে ডুবে যায়। বেশ কয়েক বছর বাদে আবার ভেসে ওঠে বটে, কিন্তু আইনত নতুন চরে আর পুরনো মালিকানা থাকে না।"

"আইন আমি জানি। আসমানির চর এর আগেও বারদুয়েক ডুবেছে এবং ভেসেও উঠেছে। তাতে কোনওবারই আমাদের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। আমরাই বরাবর আসমানির চরের স্বত্বাধিকারী ছিলাম। কেউ জবরদখল করতে সাহস পায়নি। আমাদের পাকা দলিলও আছে। এবারই প্রথম আসমানির চর বেদখল হল। আমার মনে হচ্ছে এটা ইচ্ছে করে শত্রুতাবশেই করা হয়েছে। এবারেও আসমানির চর ভেসে ওঠার পর আমার লোকেরা তার দখল নিতে গেলে গোকুলেশ্বরের দলবল তাদের লাঠিবাজি করে হটিয়ে দেয়। গোকুলেশ্বর যে একজন ডাকাত, সে কথা তো সবাই জানে।"

কোদণ্ড গজপতি একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, “তা তো বটেই। তবে সেটা অতীত। সে সারেন্ডার করায় সরকার বাহাদুর তাকে মাপ করে দিয়েছেন।”

“ওসব আমি জানি। লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য গোকুলেশ্বর আসমানির চরে একটা ডিয়ার স্যাংচুয়ারি বানিয়েছে। কিন্তু তার আড়ালে ওর অন্য খেলা আছে। ওখানে ওর গাঁজা আর আফিঙের চাষ আছে। শুনছি ওখানে সে পোলট্রি আর ফার্মিংও শুরু করল বলে। যত দূর জানি তার কোনও লিগাল ডকুমেন্ট নেই, সবটাই গা-জোয়ারি। আপনি তো তাকে অনেকগুলো চার্জেই অ্যারেস্ট করতে পারেন।”

“গোকুলেশ্বরের মৃগদাবকে গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে যে! আপনি কমপ্লেন করেছেন যে, গোকুল ওখানে গাঁজা আর আফিঙের চাষ করে, কিন্তু আমরা সার্চ করে তেমন প্রমাণ পাইনি। কোন চার্জে অ্যারেস্ট করা যায় সেটাই ভাবছি। তার উপর চারদিকে রটনা হয়েছে,আপনি আর আপনার শিকারি বন্ধুরা আসমানির চরে গোকুলের মৃগদাবে গিয়ে দুটো হরিণ মেরে এনেছেন।”

“একদম বাজে কথা। গোকুলেশ্বর কি কোনও নালিশ করেছে?”

“না। সে কাউকেই কিছু বলেনি।”

“তা হলে? গাঁয়ের লোকের তো কাজকর্ম নেই, তাই গুজব রটাতে ভালবাসে।”

কোদণ্ড খুব চিন্তিত মুখে বলেন, “বিরুবাবু, এখন কিন্তু শিকার বেআইনি। পশুপাখি মারা নিষেধ। আপনার বন্ধুদের একটু সামলে রাখবেন। না হলে আমি ঝামেলায় পড়ে যাব।”

“শিকার! কই, আমরা তো শিকার-টিকার করি না মশাই! কে যে এসব রটাচ্ছে!”

“তা অবশ্য ঠিক, গাঁয়ের লোকের গুজব রটানোর অভ্যেস আছে।”

“আপনি ওসব কথায় কান দেবেন না। বরং গোকুলেশ্বরের উপর নজর রাখুন।”

“যে আজ্ঞে!” বলে উঠতে যাচ্ছিলেন গজপতি, ফের ধপ করে বসে পড়ে বললেন, “আমি যাওয়ার সময় আপনার কুকুরেরা আবার তাড়া করবে না তো!”

“ওরা ট্রেনিং পাওয়া কুকুর, নেড়ি কুকুর নয় মশাই। নিশ্চিন্তে চলে যান।”

“আপনি কুকুরদুটোকে খুব ভালবাসেন, তাই না?”

“হ্যাঁ, সন্তানের মতো।”

“সেরকমই শোনা যায় বটে।”

ভুসিরাম আজকাল অহংকারে মকমক করে বেড়ায়। অহংকার হওয়ারই কথা কিনা। কুঠিবাড়ির কর্তার বডিগার্ড বলে কথা! হ্যাতান্যাতা লোক তো নয় রে বাবা! আর ‘বডিগার্ড’ কথাটাই তো গেরামভারী, গাঁয়ের লোক শুনলে চোখে ভারী শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে। ইংরেজি কথার ওজনই আলাদা। ইংরেজি যদি ফুটকড়াই, তবে বাংলা যেন ন্যাতানো মুড়ি। বডিগার্ড কথাটা যেমন লোককে বুক ফুলিয়ে বলা যায়, বাংলা হলে বলা যেত কি? তার উপর তার খাকি রঙের প্যান্ট আর শার্টও হয়েছে। নতুন নয় অবিশ্যি, তা হোক, খাকি মানেই হলে তুমি পুলিশ বা মিলিটারির মতোই একজন কেওকেটা। গাঁয়ের লোক হিংসের চোখে তাকিয়ে দেখে। একটা দেড়মানুষ সমান লম্বা লাঠি পেয়েছে সে, যার গাঁটগুলো পেতলে বাঁধানো। মাথায় একটা পাগড়ি বা টুপি হলে আরও ভাল হত বটে, কিন্তু সেটা এখনও জোগাড় হয়নি। যা হয়েছে তাও কম কিছু নয়।

বিরুবাবুকেও তার খুবই পছন্দ। পয়লা দিনই তিনি তাঁর দুটো শিকারি কুকুরের সঙ্গে তার ভাব করিয়ে দিলেন। সে দুটো বাঘা কুকুর তার চারদিকে কয়েকবার পাক খেল, তারপর গা শুঁকল, বেশ অনেকক্ষণ ধরে জরিপ-টরিপ করে তারপর ল্যাজ নাড়িয়ে জানান দিল যে, তারা তাকে চিনে রেখেছে। খুব ভোরবেলা কুকুরদুটোকে হাঁটাতেও নিয়ে যায় সে। তারা দিব্যি তার কথা শোনে, অবাধ্যতা করে না।

মুশকিল হল দুনিয়ায় কোনও সুখই নিষ্কণ্টক নয়। আর তার সুখের কাঁটা হল গয়াবুড়ি। সে যেদিন কাজে জয়েন দিল, সেদিন বিরুবাবু তাকে ডেকে বললেন, "ওরে, চারদিকটা ভাল করে দেখে আয়। কুঠিবাড়ি তো বিরাট জায়গা, সবটার একটা আন্দাজ থাকা ভাল।"

তাই বাড়িটা টহল দিতে বেরিয়েছিল সে। বেশ মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে, তেজস্বিতার সঙ্গেই দাপ দেখিয়ে বাগানের রাস্তায় হাঁটা ধরেছিল। বাড়ির কাজের লোকেরা বেশ সসম্ভ্রমেই তাকে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছিল। ভুসিরাম বুঝতে পারছিল এতদিনে সে একটা কাজের মতো কাজ পেয়েছে। নইলে এতকাল তো তার গুণের কোনও কদরই হয়নি! এ কাজের ইজ্জতই আলাদা। গোলাপবাগানটা সবে পেরিয়েছে কি পেরোয়নি, কোথা থেকে সাদা শাড়ি পরা এক বুড়ি পট করে সামনের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে চিল চেঁচিয়ে বলে উঠল, "অ্যাই মিনসে, তুই সেই চোর ছোঁড়াটা না?"

ভুসিরামের অহংকারের বেলুনটা ফুস করে হাওয়া ছেড়ে দিয়ে চুপসে গেল। মানসম্মান যায়-যায়। সে একটু থতমত খেয়ে বলল, "না ঠাকুরমা, আমি সে নই।"

"কেন রে, আমার চোখে কি চালসে ধরেছে? নাকি আমার ভীমরতি হয়েছে? ও মা! কী পাজি দেখ, আবার পুলিশের পোশাক পরে চোখে ধুলো দেওয়ার মতলব! এই ছোঁড়া, এই তো সেদিন তোশাখানায় ঢুকতে গিয়ে রাতবিরেতে ধরা পড়লি। বিরুর দয়ার শরীর, তাই কান ধরে ওঠবোস করিয়ে ছেড়ে দিল। কোন লজ্জায় আবার কুঠিবাড়িতে ঢুকেছিস শুনি! বেহায়া কোথাকার, বলি মতলব কী তোর?"

ভুসিরামের তখন ঘাম হতে লেগেছে, কানটান গরম। চেঁচামেচি শুনে বাড়ির লোকেরাও মজা দেখতে এসে জুটে যাচ্ছিল। ভুসিরাম আমতা-আমতা করে বলল, "আমি যে বিরুবাবুর বডিগার্ড গো ঠাকুরমা! আমায় চিনলে না!"

"চোরছ্যাঁচড় আমি খুব চিনি বাছা, ভাবছিস ইংরিজি বলে পার পেয়ে যাবি? এই গয়াদাসী কি ইংরেজিকে ডরায় নাকি? কী ভেবেছিস, ভড়কি দিয়ে পিছলে বেরোবি?"

কাঁচিকলে পড়ে ভুসিরাম কাহিল গলায় বলে, "আহা, বেরোনোর কথাই তো উঠছে না। আমার যে বিরুবাবুকে পাহারা দেওয়ার কাজ!"

"মরণ! বিরুর কি বুদ্ধিনাশ হয়েছে যে, চোরকে পাহারাদার রাখবে! কী মিথ্যুক রে বাবা! ওরে, তোরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? চোরটাকে জাপটে ধরে কটকটে করে বেঁধে ফেলতে পারছিস না?"

তা গয়াবুড়ির এ কথাটা সকলেরই বেশ পছন্দ হল। ভুসিরাম কিছু বুঝে ওঠার আগেই দশ-বারোজন তাকে ঘিরে সাপটে ধরে ফেলল। বেঁধে ফেলতেও সময় লাগল না। ভুসিরাম তার প্যাঁচপয়জার দেখানোর ফাঁকই পেল না মোটে। বাঁধা পড়ে জব্দ গলায় বলতে লাগল, "কী মুশকিল! এ তো আমার খুব অপমান হয়ে যাচ্ছে! বিরুবাবুর বডিগার্ডের কি কোনও সম্মান নেই? তিনি জানতে পারলে যে খুব রাগ করবেন!"

গয়াবুড়ি ফোঁস করে উঠল, "তোর ভাগ্যি ভাল যে, কুঠিবাড়িতে এখন আর আগের নিয়ম নেই। আগে চোর ধরা পড়লে বাঁশডলা দেওয়া হত, গাছ থেকে হেঁটমুন্ডু করে ঝুলিয়ে রাখা হত, বিলিতি চাবুক দিয়ে আগাপাশতলা চাবকানো হত। আহা, কী ভাল-ভাল সব নিয়ম ছিল। এখন কেবল শুনি ক্ষমা আর ক্ষমা। হাড়পিত্তি জ্বলে যায় বাবা!"

হরিরাম গ্যাঁট্টাগোট্টা লোক, খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠল, "তা গয়ামাসি, তোমার অত দুঃখের কী আছে বলো তো! বাঁশডলা না হয় আমরাই দিয়ে দিচ্ছি। আর হেঁটমুন্ডু করে ঝুলিয়েও দেব'খন, সে আর বেশি কথা কী! তবে বিলিতি চাবুকের তো আর জোগাড় নেই, বিছুটির ঝাড় আছে, তা দিয়েই আগাপাশতলা বেশ করে ধুইয়ে দেওয়া যাবে, কী বলো ভাইসব? বিলিতি চাবুকের চেয়ে খুব একটা কম হবে না।"

প্রস্তাবটা সকলেরই বেশ পছন্দ হল। শিবু একগাল হেসে বলল, "চোখে এক খাবলা লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলে কিন্তু রগড়টা আরও জমবে, কী বলো ভাইসব?"

কার্তিক বলে, "বিছুটির সঙ্গে কয়েকটা কাঁটাগাছও তুলে আনব কি? খুব জমে যাবে কিন্তু।"

ঘটনাটা অবশ্য তত দূর গড়াল না। গড়ালে ভুসিরামের কপালে দুর্গতি ছিল। খবর পেয়ে রাখোহরি এসে তাকে উদ্ধার করে।

সেই থেকে গয়াবুড়িকে খুব সমঝে চলে সে। কুঠিবাড়িতে গয়াবুড়ির দাপট সাংঘাতিক। তার ভয়ে সবাই তটস্থ। এ বাড়িতে দিনদশেক কেটেছে তার, তবু মুখোমুখি পড়লেই গয়াবুড়ি তার দিকে কটমট করে তাকায় আর তাকে শুনিয়েই আপনমনে বলে, "কলির শেষে তো সব উলটোই হওয়ার কথা কিনা, তাই চোর হয়েছে সেপাই। দিনে-দিনে আরও কত দেখব বাবা! এই সেদিন জলজ্যান্ত চোরটা ধরা পড়ল, ও মা! দু'দিন যেতে না-যেতেই সে দেখছি পুলিশ সেজে গ্যাটম্যাট করে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! বশীকরণ না জানলে কি এমন হয়!"

একদিন দুপুরে খেতে বসেছে, খিটখিটে মাঝবয়সি গিরিমাসি আঁশটে মুখ করে বলল, "হ্যাঁরে ছোঁড়া, দু'বেলা তো গান্ডেপিন্ডে গিলছিস আর গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, এ বাড়িতে তোকে কোন কাজে বহাল করা হয়েছে বল তো!"

ভুসিরাম বেশ জাঁক করেই বলল, "গুরুতর কাজ গো মাসি। আমি হলুম বিরুবাবুর বডিগার্ড।"

গিরিমাসি হাঁ। বলল, "কী বললি, আবার বল তো!"

"বডিগার্ড গো মাসি, বিরুবাবুকে পাহারা দেওয়ার কাজ।"

গিরিমাসি অবাক হয়ে বলে, "ও মা! বিরুবাবুর আবার পাহারার কী দরকার হল?"

"তা আমি জানি না গো মাসি, তবে খুব দায়িত্বের কাজ, চারদিকে নজর রাখতে হয়।"

"পোড়া কপাল, নজর রাখা আবার একটা কাজ! সে তো আমার বোনপোটাই রাখতে পারত! কবে থেকে ছেলেটাকে এ বাড়ির কাজে ঢোকাতে চাইছি, কোথা থেকে তুই উড়ে এসে জুড়ে বসলি বল তো! আমার বোনপো কম কীসে? ক্লাস এইট পাশ দিয়েছে, পাড়ায় নাটক করে, সুর করে পাঁচালি পড়তে পারে।"

গিরিমাসির কথা শুনে একটু দমে গেল ভুসিরাম। এ বাড়ির লোকজন তাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখছে না তো! বিরুবাবুর বডিগার্ডের কি আরও একটু খাতির পাওয়ার কথা নয়? কাজটা তো রীতিমতো বীরত্বের কাজ বলেই তার মনে হয়েছিল। অবশ্য কাজটা যে ঠিক কী, তা সে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি।

শুধু রাখোহরির কাছে শুনেছে, বিরুবাবুর নাকি খুব বিপদ। কিন্তু কীসের বিপদ, কেন বিপদ, কীরকম বিপদ তা ভেঙে বলেনি। শুধু বলেছে, "চোখ-কান খোলা রাখিস।" তা রাখছেও ভুসিরাম। বিপদ এলে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তেও সে প্রস্তুত। কিন্তু বিপদ ব্যাটাকে বাগে পেলে তো! বিরুবাবু তো দিব্যি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর ঘর থেকে মাঝে-মাঝেই হা-হা হো-হো হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে। তা হলে বিপদব্যাটা কোথায় ঘাপটি মেরে আছে?

"আছে হে, বিপদ আছে!" নিশুত রাতে যখন একতলার কুঠুরিতে শুয়ে এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল তখন তার কানের কাছ ঘেঁষে কে যেন বলে উঠল। তড়াক করে উঠে বসল ভুসিরাম, "কে? কে রে?"

কাউকে অবশ্য দেখা গেল না। মনের ভুলই হবে। দেড়-দুশো বছরের পুরনো বাড়ি তো, নানা রকম শব্দটব্দ হয়।

সেই কথাটাই ফের পরদিন আরও একজনের মুখে শোনা গেল। লোকটা হল গুণেনমিস্তিরি। সারাদিন এ বাড়ির হরেক জিনিস সারাই করে। নিজেই বলে, "আমি সারাতে পারি না এমন কলকবজা এখনও দুনিয়ায় তৈরিই হয়নি।"

দুপুরে পিছন দিককার বারান্দায় বসে একটা পুরনো দেয়ালঘড়ি সারাচ্ছিল। তাকে দেখে বলে উঠল, "এ বাড়িতে কাজ করে সুখ নেই, বুঝলে। দেড়শো কি দুশো বছরের পুরনো ঘড়ির আসল পার্টস কি বাজার ঢুঁড়ে পাওয়া যাবে, তুমিই বলো! কিন্তু বুড়োটাকে সে কথা বোঝায় কার সাধ্যি! সেই তখন থেকে কানের কাছে টিকটিক করে যাচ্ছে,আমি নাকি পুরনো পার্টস চুরি করে ভেজাল মাল ভরে দিচ্ছি। চোখ রাঙাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, বলছে, আমাকে নাকি গ্রামছাড়া করে ছাড়বে, নির্বংশ করে দেবে। এরকম তাড়না করলে কি মন দিয়ে কাজ করা যায়?"

ভুসিরাম অবাক হয়ে বলে, "বুড়োটা কে বলো তো!"

"দু'দিন থাকো, তুমিও চিনবে। এ হল বুড়ো ভঞ্জ। পটল তুলেছে বটে, কিন্তু পরলোকে যাওয়ার নামটি নেই। ঘাঁটি আগলে এখানেই খুঁটি গেড়ে পড়ে আছে। বললুম, 'বড়কর্তা, দেহ তো ছেড়েছেন, এখনও এইসব তুচ্ছ মায়ায় আটকে আছেন কেন? আপনার কি ঊর্ধ্বগতি হয়নি?' শুনে যা শাপশাপান্ত করল তা বলার নয়।"

ভুসিরাম চমকে উঠে বলে, "ভূত নাকি?"

"ভূত তো ভূতের মতো থাকলেই হয়। মাঝে-মাঝে দেখা দিয়ে ভয়টয় দেখিয়ে ফের নিজের জায়গায় ফেরত যাবে, এটাই তো নিয়ম। এঁর তো সে বালাইও নেই। চক্ষুলজ্জা থাকলে তো! ইনি তো দিনেদুপুরে উদয় হয়ে হম্বিতম্বি জুড়ে দিচ্ছেন। ভূত বলে যে একটু মান্যিগন্যি করব, তারও উপায় রাখেননি। যখন তখন উদয় হলে কি আর ভূতের মানমর্যাদা থাকে! আমি বলেই জোড়াতাড়া দিয়ে এ ঘড়ি খাড়া করার চেষ্টা করছি। ঘড়ির দোকানে নিয়ে গেলে এ ঘড়ি তারা ছোঁবেও না, পেন্নাম করে বলবে, 'এঁর গায়ে হাত দেওয়ার সাহসই আমাদের নেই, বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রেখে দিন, খোঁচাখুঁচি করবেন না।' তা কর্তা সেকথা মানতেই চায় না।"

"তা হলে তো বড় মুশকিল হল গুণেনদাদা, একেই তো দেখছি এ বাড়ির কেউ আমাকে তেমন পছন্দ করছে না, তার উপর যদি ভূতের তড়পানি সহ্য করতে হয় তা হলে তো গেলাম।"

"তা তোমার এ বাড়িতে কাজটা কী বলো তো!"

“আমি হলুম বিরুবাবুর বডিগার্ড।”

“বডিগার্ড! আরে দূর-দূর, তুমিও যেমন!”

ভুসিরাম অবাক হয়ে বলে, “তার মানে?”

“বেশি ভেঙে বলতে চাই না, তবে মনে হয় এর পিছনে অন্য মতলব আছে। একটু সাবধানে থেকো।”

“তার মানে কি আমি বিরুবাবুর বডিগার্ড নই?”

“বিরুবাবুর কি বডিগার্ডের অভাব পড়েছে যে, তোমাকে বহাল করবে? ওই যে চারটে শিকারিকে পুষছে, তা কি এমনি? বিরুবাবুর আসল বডিগার্ড হল ওরা। চোখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেই বুঝবে, ওরা কেউ তেমন সুবিধের লোক নয়। ওদের প্রত্যেকের পিছনে লম্বা লেজ আছে। নানা কুকর্মের লেজ।”

ভুসিরাম একটু মুষড়ে পড়ে বলল, “তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী বলো তো!”

“তা জানি না, তবে সাবধানের মার নেই।”

ভুসিরাম শুকনো মুখে বলে, “শুনেছিলাম আমাকে রাখা হয়েছে, কারণ বিরুবাবুর নাকি খুব বিপদ।”

“সে কথা সত্যি। বিপদ বলে বিপদ! যাকে ঘাঁটিয়েছেন, সে তো সোজা পাত্র নয়। যে শত্রু তড়পায় বা হুমকিধামকি দেয়, তাকে তত ভয় নেই। কিন্তু যে শত্রু টুঁ শব্দটি করে না, সে বড় ভয়ংকর। গোকুলেশ্বরকে যারা জানে তারাই জানে, সে ভাল থাকলে গঙ্গাজল, খেপলে মুচির কুকুর। তুমি বাহাদুর ছেলে হতে পারো, কিন্তু গোকুলেশ্বরের কাছে তুমিও নস্যি। বুঝলে?”

“তাই তো! তা হলে আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে? শুধু দুটো কুকুরকে চান করানো, খেতে দেওয়া, আর হাঁটাতে নিয়ে যাওয়া?”

“আহা, সেটাই বা খারাপ কী বলো। দিব্যি চাকরি, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। যাই বলো, মানুষের চেয়ে বরং কুকুরকে আমার ভাল বলে মনে হয়। ভেবে দেখলে বিরুবাবুর বডিগার্ড হওয়ার চেয়ে কুকুরের বডিগার্ড হওয়া অনেক ভাল।”

“দূর! শেষ অবধি কুকুর সামলাতে হবে জানলে এ চাকরি নিতুম নাকি?”

“তা অবিশ্যি ঠিক। লোকে বলবে কুকুরের চাকর। আমিও কানাঘুষো শুনেছি যে, তুমি এলেমদার ছেলে। কিন্তু আজকাল গুণের কে আর কদর করছে বলো। এই আমার কথাই যদি ধরো, কোনও ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে কি আমি কম? শুধু পাশটা করিনি, তাই লোকে নাক সিঁটকে বলে ‘মিস্তিরি’। কেউ আমার দামও দিল না, মর্মও বুঝল না।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে ফিরে এল ভুসিরাম।

ভাল জাতের কুকুরদের একটা লক্ষণ হল, তারা সহজে বিচলিত হয় না। নেড়িকুকুর যেমন কাকপক্ষী বা বেলুনওয়ালা বা বহুরূপী দেখলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, তেমনই এরা আবার সেসব মোটেই গ্রাহ্য করে না। কদাচিৎ এদের গলা শোনা যায়। কিন্তু যখন ডাকে, তখন মনে হয় মেঘ ডাকছে। কয়েকদিনেই কুকুরগুলোকে বুঝে নিয়েছে ভুসিরাম। খুব ভোরে, আলো ফোটার আগেই ভুসিরাম কুকুরদুটোকে নিয়ে রাস্তায় দৌড়োচ্ছিল। তার বাঁ পাশে রিম আর ডান পাশে ঝিম। চামড়ার লম্বা ফিতে দিয়ে দু’জনেই তার কোমরের সঙ্গে বাঁধা। সে কুকুরের বডিগার্ড হতে রাজি নয় বটে, কিন্তু রিম আর ঝিমের সঙ্গে মেলামেশা করতে তার খারাপ লাগে না। রিম আর ঝিম সোজা সরল মানুষ, কোনও বায়নাক্কাও নেই, চক্করও নেই। চুরিচামারি করে

না, মিছে কথা কয় না, কাউকে হিংসে করে না, পরনিন্দা নেই, গালাগাল দেয় না, আর কী চাই? দুটোরই চেহারা বিশাল, ভুসিরামের কোমরের সমান উঁচু, ছুঁচোলো লম্বা মুখ, সরু পা, লকলকে তেজালো বাদামি রঙের শরীর, সরু পেট। দেখলেই মালুম হয় খানদানি জীব। এদের দেখলেই আশপাশের পাড়ার নেড়ি কুকুরেরা প্রবল চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, তবে কাছে ভিড়তে সাহস পায় না। রিম আর ঝিম অবশ্য নেড়িদের গেরাহ্যের মধ্যেই আনে না।

রোজই কুলতলির মাঠে নিয়ে গিয়ে বল বা পাবড়া ছুড়ে রিম-ঝিমকে দৌড় করায় ভুসিরাম। কুলতলির মাঠের দিকে মোড় ঘুরতেই হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক উদয় হয়ে তার পাশাপাশি দৌড়পায়ে সঙ্গ নিল।

লোকটা বেঁটেমতো, গোলপানা মুখ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ঠোঁটে বোকা-বোকা একটা হাসি ঝুল খেয়ে আছে। সঙ্গ ধরে ভারী আহ্লাদের গলায় বলল, "বাহ বাহ, তোমার ছাগলদুটি তো বেড়ে! কোথা থেকে জোগাড় হল বলো তো!"

পাগল-টাগলই হবে বোধহয়। ভুসিরাম বিরক্ত হয়ে বলে, "খুড়ো, চোখের চিকিৎসা করাও গিয়ে। দুটো বাঘা কুকুরকে কি তোমার ছাগল বলে মনে হচ্ছে?"

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলে, "বলো কী! এ দু'টি ছাগল নয়? আমি হলুম গে গন্ধেশ্বর, তিন পুরুষের ছাগলের ব্যাপারি, আমার তো ভুল হওয়ার কথাই নয়। তোমাকে কেউ কুকুর বলে ছাগল গছিয়ে দেয়নি তো! আমি তো কই কুকুরের নামগন্ধও দেখতে পাচ্ছি না। এ তো নিকষ্যি দিশি ছাগল, তবে হ্যাঁ, গায়েগতরে বেশ পুরুষ্টু আছে বটে!"

"বুঝলে খুড়ো, তোমার ভালর জন্যই বলছি, শুধু চোখ নয়, তোমার মাথারও চিকিৎসা দরকার। এ দুটো শুধু কুকুর নয়, শিকারি কুকুর। বুঝলে? ছাগল ভেবে যদি গায়ে হাত দিতে যাও তা হলে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।"

গন্ধেশ্বর ভারী অবাক হয়ে ঘ্যাসঘ্যাস করে মাথা চুলকে বলে, "তাই তো! তুমি বলছ কুকুর, কিন্তু আমি যে দেখছি ছাগল! এ তো বড় তাজ্জব ঘটনা হে! বুঝলে,আমরা হলুম তিন পুরুষের ছাগলের কারবারি। ছাগল ঘেঁটে চুল পাকিয়ে ফেললুম, সেই আমারই কিনা এত বড় ভুল হচ্ছে!"

"আহা, ভুল মানুষের তো কতই হয়। কথায় বলে, রজ্জুতে সর্পভ্রম।"

লোকটা তবু তার সঙ্গ ছাড়ল না, পাশাপাশি দৌড়পায়ে ছুটতে-ছুটতেই বলল, "তবু বলি কী, বরং আরও একবার ভেবে দেখো, কুকুর বলে তোমাকে কেউ ছাগল গছিয়ে দিয়েছে কি না। ঠগ-জোচ্চোরে তো দেশ ভরে গিয়েছে ভাইপো!"

"ভাবাভাবির কিছু নেই খুড়ো, তাতে কুকুরকে তো আর ছাগল বানানো যাবে না।"

"দুনিয়ায় কত কী হয় হে বাপু, তার কি কোনও ঠিক আছে!"

জবাবে ভুসিরাম একটু রাগ করেই কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর ফুরসতই হল না। হঠাৎ ঘাড়ের কাছটায় একটা ছুঁচ ফোটার মতো কিছু টের পেল সে। তারপরই চোখ অন্ধকার। কুলতলির মাঠে ঢুকবার মুখে যে শিশু গাছটা আছে তার তলায় ধপাস করে পড়ে অচেতন হয়ে গেল ভুসিরাম।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন ভুসিরাম হাঁ। তার কোমরের সঙ্গে লম্বা চামড়ার ফিতেয় বাঁধা দূটো ছাগলই তো বটে! সে দু'চোখ কচলে আবার ভাল করে ঠাহর করল। ভুল নেই। দুটো ছাগলই, আর তারা নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে বটে তবু রোদের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল যে, খুব বেশিক্ষণ সে অজ্ঞান হয়ে ছিল না। বড় জোর পাঁচ-দশ মিনিট। আর তার মধ্যেই তার দু'-দুটো বাঘা শিকারি কুকুর ছাগল হয়ে গিয়েছে। মাথায় হাত চেপে খানিকক্ষণ বসে রইল সে। ঘটনাটা বুঝে উঠতে চেষ্টা করল। একটু-একটু বুঝতেও পারল যেন। দুনিয়ায় তার চেয়ে ঢের-ঢের চালাক লোক যে অনেক আছে, তাতে সন্দেহ কী? কিন্তু তাকে যে এত সহজে বোকা বানানো যায়, এটা বুঝতে পেরে তার নিজের জন্যই আজ বড় দুঃখ হল।

আধঘণ্টা বাদে ভুসিরাম যখন বিরুবাবুর বৈঠকখানায় তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার মাথা হেঁট। বিরুবাবুর দু'পাশের চেয়ারে আজও তাঁর চার শিকারি বন্ধু বসা। পাশে দাঁড়িয়ে রাখোহরি। চুপ করে বসে

ঘটনাটা শুনলেন বিরুবাবু। মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠল। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর রাখোহরির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমার রাইফেল! এক্ষুনি!"

শুঁটকো উপেন হাজরা অবাক হয়ে বলেন, "কী করতে চাইছেন বিরুবাবু?"

"আমি এখনই আসমানির চরে যাব। গোকুল আমার রিম-ঝিমকে না হলে মেরে ফেলবে।"

"মাথা ঠান্ডা করুন মশাই। তৈরি না হয়ে ওরকম লোকের পাল্লা নিতে গেলে যে মারা পড়বেন! গোকুল তো আর মশা-মাছি নয়!"

"আমি ওর দুটো হরিণ মেরেছি, তার বদলে ও নিশ্চয়ই আমার রিম-ঝিমকে মেরে শোধ নেবে।"

"এ সময়ে ঝোঁকের বশে কিছু করতে যাওয়াটা অবিমৃশ্যকারিতা হবে যে! আগে ঠান্ডা মাথায় ভেবে একটা প্ল্যান করে তবেই এগোনো উচিত।"

"কিন্তু আমার রিম-ঝিমকে যদি মেরে ফেলে?"

"সেই ভয় তো আছেই। তবু আগে একটু ভাবুন, আর পুলিশকেও জানিয়ে রাখুন।"

খগেন মাল ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কিছু একটা ভাবছিল। বলল, "মোক্ষম চাল মশাই! আপনার সবচেয়ে দুর্বল জায়গাতেই খোঁচাটা দিয়েছে। উপেনদা ঠিকই বলেছেন, ওরকম লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে হলে কোমর বেঁধেই নামতে হবে। নইলে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে আমাদের।"

বিরুবাবু ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর দু'হাতে মুখটা চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

গুঁফো বলাই জানা কানে একটু খাটো, ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগছিল। হঠাৎ বলল, "ওর ছাগলদুটোকে আজই কেটে খেয়ে ফেললেই তো হয়।"

রাখোহরি ধমকের সুরে বলে, "খবরদার ওই ভুল করবেন না। আমার বিশ্বাস গোকুলের চরেরা সব কিছু নজরে রাখছে।"

॥ ৬ ॥

বলতে নেই, কুঠিবাড়ির খাওয়াদাওয়া বড্ডই উঁচু থাকের। সকালের জলখাবার থেকে নৈশভোজ, সবক'টাই রাজকীয় বললেই হয়। খগেন মাল খাইয়ে মানুষ, উপেন হাজরার মতো পেটরোগা নয়। কিন্তু এই চল্লিশের চৌকাঠে এসে সে টের পায় যে, একটু নেয়াপাতি ভুঁড়ির আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে। যদিও এখনও খগেনের চেহারা পালোয়ানের মতোই, রীতিমতো ডনবৈঠক করা শরীর। কিন্তু এত সুখাদ্যের ঠেলায় যে শরীর বেশিদিন এমন থাকবে না, তাও সে জানে। তাই ইদানীং প্রাতঃভ্রমণের মাত্রাটা বাড়াতে হয়েছে। মাইলপাঁচেক হাঁটে, তারপর ফিরে এসে ডনবৈঠকও করে।

আজ সকালেও বেরিয়েছিল। সাবধানের মার নেই বলে আজ কাঁধে বন্দুকটাও নিয়েছিল। অবশ্য তার ভয়ডর বরাবরই কম। খুব চোটেপাটে হাঁটতেই ভালবাসে সে। প্রথম চোটেই একদমে মাইলতিনেক পেরিয়ে গোহাটা হয়ে যখন কুলতলির পেল্লায় মাঠের কাছাকাছি হয়েছে, তখনই দেখল খোলকত্তাল সমেত একটা ছোটখাটো কেত্তনের দল আসছে। কেত্তন খগেনের প্রিয় জিনিস। সে নিজেও মাঝে-মাঝে একাই কেত্তন গায়। কেত্তনের দলটাকে পথ ছেড়ে দিতে সে রাস্তার ধারের দিকে সরে দাঁড়িয়েছিল। দলটা তাকে ছাড়িয়ে যেতে গিয়েও হঠাৎ একজন হাত বাড়িয়ে "আসুন দাদা..." বলে তার হাত ধরে কেত্তনে সামিল করে নিল।

এদিকে বেলা দশটা অবধি খগেন মর্নিং ওয়াক থেকে না ফেরায় লোকে খুঁজতে বেরোল। কিন্তু কোথাও তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

বিরুবাবু আর তার তিন শিকারি বন্ধু বৈঠকখানায় বসা। বিরু গম্ভীর মুখে বললেন, "আপনারা কিছু বুঝছেন?"

গিরিধারী মাথা নেড়ে বলে, "আমি ভাল বুঝছি না। খগেনের কিছু একটা ঘটেছে। আমার পাশের ঘরটাই তো খগেনের, রোজ সকাল সাতটায় ফিরে সে ডনবৈঠক করে। কোনও কামাই নেই।"

উপেন হাজরাও মাথা নেড়ে বলে, "আমারও তাই মত।"

দুপুরে কোদণ্ড গম্ভীর মুখে এসে বসলেন। কপালের ঘাম রুমালে মুছে বললেন, "অপহরণই হয়েছে, নাকি নিজেই চলে গিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তো!"

বিরু গম্ভীর হয়ে বলেন, "না। খগেনবাবু আমাকে না বলে যাবেন না। তা ছাড়া তাঁর সব জিনিসপত্রও পড়ে আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে এখন গোকুলের ডেরায় পাওয়া যাবে।"

কোদণ্ড বলেন, "বিরুবাবু, আমাদের সার্চপার্টি গোকুলের ডেরা ঘুরে দেখে এসেছে। সেখানে নেই।"

কুঠিবাড়ির আবহাওয়াটা হঠাৎ করেই পালটে গেল। আড্ডা নেই, হাসি নেই, কথাবার্তা কমে গিয়েছে।

বিকেলের দিকে বাড়ির নিরিবিলি লনটাতে বেতের চেয়ারে বসে ছিল গুঁফো বলাই। মনটা আড় হয়ে আছে, তাই দুপুরে ভাতঘুমটা হয়নি। গাছপালায় ঘেরা লনটায় বসে ঠান্ডা হাওয়ায় বেশ ভালই লাগছিল।

এমন সময় একটা ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে একটা চিনেমাটির বাটিতে গরম ঘুগনি এনে তার হাতে দিয়ে বলল, "গোবিন্দদা পাঠিয়ে দিলেন।"

বলাই খুশিই হল। দুপুরে খাওয়াটা জমেনি। এই পরিস্থিতিতে জমার কথাও নয়। গোবিন্দ এ বাড়ির রাঁধুনি। বড় ভাল তার রান্নার হাত। যা রাঁধে তাই যেন অমৃত। ঘুগনিটাও বড্ড ভাল বানিয়েছে। গুঁফো বলাই ভারী তৃপ্তি করে খেল। আর ঘুগনিটা পেটে যেতেই আরামে ঘুম পেয়ে গেল তার। একটু তফাতে বসে গুণেন মিস্তিরি একটা হুইল ব্যারোর ভাঙা চাকা সারাই করছিল। হঠাৎ উঠে হুইল ব্যারোটা ঠেলে নিয়ে এসে চোখের পলকে পাঁজাকোলায় বলাই জানাকে হুইল ব্যারোটায় তুলে সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে কামিনী ঝোপটার আড়ালে রেখে এল। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দুটো মুনিশ গোছের লোক একটা লতানে গোলাপের জটিল ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ব্যারোটা ঠেলে পিছনের ফটকের বাইরে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

যথারীতি বিকেল গড়াতে না-গড়াতেই চাউর হয়ে গেল খবরটা। বলাই জানা হাপিশ। বিরুবাবু রাগে গরগর করতে লাগলেন। কোদণ্ড আবার এসে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "আমরা সব রকম চেষ্টা করছি। ভাববেন না।"

সন্ধেবেলা নিজের জিনিসপত্র সুটকেসে গুছিয়ে ফেলছিল গিরিধারী। তার চোখেমুখে প্রবল উদ্বেগ। রাখোহরি এসে বলল, "আমাকে ডেকেছিলেন গিরিধারীবাবু?"

গিরিধারী বলে, "হ্যাঁ ভাই, কাল আমি সকালের ট্রেন ধরব। সকাল ছ'টার মধ্যে গাড়ির বন্দোবস্ত করে দাও ভাই।"

রাখোহরি অবাক হয়ে বলে, "আপনি কি চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ ভাই, আমি হার্টের রোগী। উত্তেজনা আমার সহ্য হয় না। এখানে থাকলে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। আমাকে বাঁচাও ভাই।"

রাখোহরি বলল, "ঠিক আছে।"

সকালেই কথামতো রওনা হয়ে গেল বটে গিরিধারী, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভার ফিরে এসে জানাল, রাস্তায় একটা গাছ পড়ে গিয়েছিল বলে তাকে গাড়ি থামাতে হয়েছিল। নেমে সে গাছটা সরানোর চেষ্টা করতে যায়। ফিরে এসে সে আর গিরিধারীবাবুকে খুঁজে পায়নি। তিনি গাড়িতে বা আশপাশে কোথাও ছিলেন না।

কুঠিবাড়ি আরও থমথমে হয়ে গেল।

যথারীতি কোদণ্ড এলেন। অবাক হয়ে বললেন, "এসব হচ্ছে কী বলুন তো! আমার ফাঁড়িতে স্টাফ খুব কম, তবু আমি যথাসাধ্য নজর রাখছি। গোকুলের আস্তানায় আসমানির চরে দিনরাত আমার লোক মজুত আছে। তবু তিন-তিনজন লোক হাওয়া হয়ে যায় কী করে?"

বিরুবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "জবাবটা তো আপনাকেই দিতে হবে, কোদণ্ডবাবু।"

কোদণ্ড গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, "এ তো ভূতুড়ে কাণ্ড মশাই! জবাব দেব কী, আমি নিজেই মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। উপেনবাবু, আপনি একটু সামলে থাকবেন। এবার বোধহয় আপনার পালা।"

উপেন অত্যন্ত চিন্তান্বিত মুখে বলে, "আমি কাউকে সুযোগ দিতে রাজি নই। চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে পিস্তল থাকে।"

"খুব ভাল মশাই। সিটিজেনরা নিজের দায়িত্ব নিতে শিখলে পুলিশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

কোদণ্ড চলে যাওয়ার পর দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। চিন্তিত,উদ্বিগ্ন। অনেকক্ষণ বাদে উপেনবাবু বললেন, "নেটওয়ার্কটা খুব ভাল।"

"কার কথা বলছেন?"

"গোকুলের কথা। আপনারও কি মনে হয় না, গোকুল একজন ভাল অর্গানাইজ়ার? মৃগদাবে গিয়ে হরিণ মারার আইডিয়াটা কার ছিল বলুন তো!"

"খগেনবাবুর।"

"ভেরি কাওয়ার্ডলি আইডিয়া।"

"এখন আর ভেবে লাভ কী? তির একবার ছুড়ে ফেললে তা তো আর ফেরানো যায় না।"

"আপনি আমাকে আপনার পরামর্শদাতা হিসেবে রেখেছেন, কিন্তু কার্যত আমার পরামর্শ কিন্তু আপনি কানেই তোলেন না। আপনারা এখনও মেজাজে সামন্তই আছেন তো, তাই নিজের সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত ভাবেন সবসময়। আমি আপনাকে মৃগদাবে গিয়ে হরিণ মারতে নিষেধ করেছিলাম কি না!"

বীরবাহু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "হ্যাঁ, আপনি বারণ করেছিলেন। আপনার কথা শুনলে হয়তো আজ এই পরিস্থিতি হত না। কিন্তু এখন তো আমাদের পিছু হাঁটবার পথ নেই। গোকুলকে শিক্ষা দিতেই হবে। প্রথম রাউন্ডে সে হয়তো জিতে গিয়েছে, কিন্তু পরের রাউন্ডে তা হবে না।"

উপেন হাজরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, "একটা জিনিস কি আপনি টের পান?"

"কীসের কথা বলছেন?"

"আপনি কি টের পান যে, এই কুঠিবাড়িতে আপনার প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই?"

বীরবাহুর মুখে রাগের একটা রক্তিমাভা ফুটে উঠল। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন, "কী যা তা বলছেন? এরা বেশির ভাগই আমাদের অনেক পুরনো কর্মচারী। এরা আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে।"

"তা হয়তো পারে। এরা যে আপনার অনুগত, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু আনুগত্যও দু'রকমের। একটা হল বেতনভুকের আনুগত্য, আর-একটা হল ভালবাসার আনুগত্য। দুটোয় অনেক তফাত। এদের আনুগত্য বেতনভুকের।"

বীরবাহু ধৈর্যচ্যুত হয়ে তীব্র গলায় বলেন, "বাজে কথা। আপনার চেয়ে ওদের আমি বেশি চিনি।"

"রাগ করবেন না। ভাল করে ভাবুন। খগেন আর গিরিধারীর কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু বলাইয়ের ঘটনাটায় আমার খটকা লাগছে। তাকে এই বাড়ি থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাও দিনেদুপুরে, সকলের নাকের ডগা দিয়ে। অথচ আপনার কর্মচারীরা সবাই বলছে যে, কেউ কিছু দেখেনি। আপনার এতগুলো কর্মচারীর কারও চোখে কিছু পড়ল না, এটা কী করে হয়? আমার তো সন্দেহ হয় অপহরণটা হয়েছে এদের যোগসাজশেই।"

বিরু প্রায় গর্জন করে উঠলেন, "অসম্ভব! হতেই পারে না!"

উপেন হাজরা চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

বিরু অন্যমনস্কভাবে বলল, "বলুন।"

"গোকুলেশ্বর লোকটা ঠিক কেমন, জানেন?"

বীরবাহু ধৈর্য হারিয়ে বিরক্তির গলায় বলে, "একজন ডাকাত আর কেমন হবে? ডাকাতরা যেমন হয় তেমনিই। আমি তো এখানে থাকি না, মাঝে-মাঝে আসি। গোকুল সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জানা নেই। এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

“আপনি আপনার রিম আর ঝিমের জন্য খুব টেনশনে আছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।”

“কী মনে হচ্ছে?”

“আমার অনুমান হচ্ছে, যদিও ভিত্তিহীন অনুমান, তবু মনে হচ্ছে গোকুলেশ্বর আপনার কুকুরদের মারেনি।”

বিরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “আপনার অনুমানের উপর ভরসা করতে পারছি না। ডাকাত গোকুলেশ্বর খুব নৃশংস ছিল বলে শোনা যায়। তার দাপটে গোটা পরগনা তটস্থ ছিল। সে বদলা না নিয়ে ছাড়বে, এ কথা ভাবলেন কী করে?”

খুব মৃদু স্বরে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো গলায় উপেন বলে, “তা হলে লোকটা কি হিপনোটিজ়ম জানে? এতগুলো লোককে কি মন্ত্রে বশ করে ফেলল! কেন আমার মনে হচ্ছে যে, এরা সবাই, এমনকী পুলিশ অবধি ওর হয়ে কাজ করছে?”

বিরু তেতো গলায় বলে, “আপনি একসময়ে পুলিশের গোয়েন্দা ছিলেন বলেই ভাববেন না যে, সব জায়গায় আপনার অনুমান খেটে যাবে। আমার লোকেরা কেউ মরে গেলেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, আর পুলিশও নিয়মিত আমার মাসোহারা পায়।”

উপেন গম্ভীর মুখে শুধু বলল, “হুঁ।”

সারাদিনটাই উপেন চুপচাপ রইল। চিন্তা করল। বিকেল হতেই সে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল। কুঠিবাড়ির ফটকের দিকে হাঁটা ধরতেই রাখোহরি এসে পথ আটকে বলল, “কোথায় যাচ্ছেন?”

উপেন চিন্তিত মুখে বলে, “একটু বেরোচ্ছি।”

রাখোহরি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, “সর্বনাশ!”

উপেন হেসে বলে, “ভয় পেয়ো না। আমি সাবধানি মানুষ।”

“তা জানি। কিন্তু একা বেরোনো ঠিক হবে না। দাঁড়ান, সঙ্গে ভুসিরামকে দিচ্ছি।”

“না, তার দরকার নেই। সঙ্গে লোক থাকলেই বরং সমস্যা।”

“পিস্তলটা সঙ্গে নিয়েছেন কি?”

“না হে, পিস্তল কি আর সব সময়ে কার্যকর হয়?”

উপেন বেরিয়ে পড়ল। কুলতলির মাঠটা একটু দূরে। তাড়াহুড়ো করল না উপেন, ধীরেসুস্থে দুলকি চালে হাঁটতে লাগল। পথ নির্জন, গাছপালায় ঢাকা, অন্ধকারমতো। বড় একটা ঝুপসি বটগাছতলা পেরোবার সময়েই হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ভারী আদুরে গলায় বলল, “পেন্নাম হই কর্তা।”

উপেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বেঁটেমতো গোল মুখওয়ালা, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা লোক মুখে একটু বোকা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

উপেন একটু হেসে বলে, “কে গো তুমি?”

“আজ্ঞে আমি হলুম গে গন্ধেশ্বর। তিন পুরুষের ছাগলের কারবারি। তা ছাগল খুঁজতে বেরিয়েছেন নাকি কর্তা?”

“হ্যাঁ গো গন্ধেশ্বর, আমি তো ছাগলের খোঁজেই বেরিয়েছি। তা তোমার খোঁজে আছে নাকি ভাল ছাগল?”

"তা আর নেই! কী যে বলেন কর্তা। তিন পুরুষের কারবার মশাই, সব রকমের ছাগল পাবেন।"

উপেন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "দেখো গন্ধেশ্বর, তোমার ওই মরফিন ইনজেকশনের দরকার নেই কিন্তু। আমি নিজেই যাচ্ছি চলো।"

গন্ধেশ্বর ভারী লজ্জা পেয়ে বলে, "কী যে বলেন কর্তা! আপনি হলেন বিবেচক মানুষ, এরকম মানুষের সঙ্গে কাজ কারবার করে সুখ আছে। কী বলেন?"

"তোমাকে দেখেও বেশ হুঁশিয়ার লোক বলে চেনা যায়।"

"তা দিনকাল যা পড়েছে কর্তা, হুঁশিয়ার না হয়ে উপায় আছে? তা এই বড় রাস্তাটা ছেড়ে ওই বাঁদিকের শুঁড়িপথটা ধরলে পথ একটু কম হবে কর্তা।"

"তুমি যা বলবে। এখন তো তোমার হুকুমেই চলতে হবে, কী বলো?"

লজ্জায় জিব কেটে গন্ধেশ্বর বলে, "কী যে বলেন কর্তা, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। গরিবের আস্তানায় একটু পায়ের ধুলো দিতে যাচ্ছেন বই তো নয়! কত ভাগ্যি আমার বলুন!"

উপেন খুশি হয়ে বলে, "না হে, তুমি সহবত জানো বটে!"

সারারাত বীরবাহুর ঘুম হয়নি। এপাশ-ওপাশ করে রাত কেটেছে। সকালে এসে যখন বৈঠকখানায় বসলেন তখন শরীরে গভীর ক্লান্তি, মনে আদিগন্ত হতাশা। সকালের নরম আলোটাও চোখে অসহ্য লাগছে।

রাখোহরি এসে সামনে দাঁড়াল, "আমাকে কি ডেকেছিলেন, বিরুবাবু?"

"হ্যাঁ, রাখোহরি। তুমি অনেকদিন আমার সঙ্গে আছ, বন্ধুর মতোই মিশেছ, তোমাকে আমি বিশ্বাসও করি সবচেয়ে বেশি। আমাকে একটা কথা বলবে?"

"কেন বলব না? কথাটা কী?"

স্থির দৃষ্টিতে রাখোহরির চোখে চোখ রেখে বিরু বলেন, "অকপটে বলবে তো? মনরাখা কথা নয় কিন্তু!"

"না, মনরাখা কথা বলার সময় বোধহয় এটা নয়।"

"তা হলে বলো তো, আমি কি হেরে গিয়েছি?"

রাখোহরি কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, "সব খেলায় কি জিত হয় বিরুবাবু? হারজিত তো আছেই।"

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিরু বলেন, "বুঝেছি রাখোহরি। তোমাকে ধন্যবাদ। এবার আমাকে বেরোতে হবে।"

রাখোহরি কোমল গলায় বলে, "কোথায় যাবেন?"

"আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, হেরে গেলে হার স্বীকার করতে হয়।"

রাখোহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "ঠিক আছে, বিরুবাবু।"

ঘণ্টাখানেক বাদে আসমানির চরে বীরবাহুর নৌকো এসে লাগল। বীরবাহু নৌকো থেকে নামলেন। তারপর মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন আসমানির চরের সৌন্দর্যের দিকে। সকালের আলোয় আসমানির চর ভেসে যাচ্ছে, চারদিকে সবুজের বন্যা। এত পাখির ডাক যেন কোনওদিন শোনেননি তিনি। কী শান্ত, সমাহিত এক সকাল। সামনে সোনালি একটুখানি বালিয়াড়ি, তারপর আশ্চর্য তৃণভূমি। নির্ভয়ে বিচরণ করছে হরিণ আর

হরিণ। একটা হরিণ তৃণভূমি থেকে তার মায়াবী চোখ তুলে দেখছিল বীরবাহুকে। চোখে কোনও ঘৃণা নেই, অসূয়াও নেই। বীরবাহু ধীরে ধীরে বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলেন। বনভূমির ভিতর দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে।

বনভূমিতে ঢোকার ঠিক মুখেই বেঁটেখাটো খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা হাসিমুখের একটা লোক ভারী আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠল, "পেন্নাম হই কর্তা। আমি হলুম গে গন্ধেশ্বর। ছাগলের কারবারি কর্তা। তিন পুরুষের কারবার। এই যে এদিকে সটান চলে আসুন। কোনও ভয় নেই।"

বেশ অনেকটা হেঁটে গেলে মৃগদাব, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার ভিতর দিয়েই পায়ে চলার পথ। শেষে একটা ঘাসে ঢাকা বড় উঠোনের মতো। সেখানে সবুজ ঘাসের উপরেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে দীর্ঘকায়, ছিপছিপে চেহারার শ্যামবর্ণ একজন মানুষ। গালে অল্প দাড়ি আর গোঁফ, কাঁধ পর্যন্ত কালো চুল, আর অপরূপ হরিণের মতোই টানা-টানা দুখানি চোখ। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের আশপাশে। গায়ে একটা সাদা উড়ুনি, পরনে খাটো ধুতি। আর আশ্চর্য কাণ্ড হল, তার দু'পাশে বসে আছে বশংবদ দুটি কুকুর। রিম আর ঝিম। তারা বীরবাহুর দিকে তাকালও, কিন্তু চিনতে পারল বলে মনেই হল না। জীবনে এত অবাক বোধ হয় বীরবাহু কখনও হননি। তাঁর দিকে চেয়ে মন্দ্রস্বরে গোকুলেশ্বর বলল, "বোসো বিরুবাবু। মাটিতে বসতে যদি আপত্তি থাকে, তা হলে চেয়ারেরও ব্যবস্থা আছে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাসের উপরেই বসে পড়লেন বীরবাহু। নিষ্পলক চোখে গোকুলেশ্বরের দিকে চেয়ে রইলেন।

গোকুলেশ্বর অনুত্তেজিত গলায় বলে, "জমির দলিল কখনও মন দিয়ে পড়েছ, বিরুবাবু? দলিল বড় জটিল ভাষায় লেখা হয়। তবু পড়ে দেখো, জমির মালিক তুমি নও, সরকার। সরকার তোমাকে ভোগদখলের অধিকার দিচ্ছে মাত্র। তুমি উপস্বত্ব ভোগকারী। তলিয়ে ভাবলে জমির মালিক সরকারও নয়, উপরওয়ালা। সুতরাং আসমানির চর তোমারও নয়,আমারও নয়। ভাল করে ভেবে দেখো, তোমার ছেলেমেয়েও কি তোমার? তুমি সৃষ্টিকর্তা তো নও, জন্মদাতা মাত্র। তারাও ওই উপরওয়ালার। তুমি বা আমি রক্ষক মাত্র, যাকে ইংরেজিতে বলো 'কাস্টোডিয়ান'। আমি তো অনেক পাপ করেছি, লুটতরাজ করেছি, নিয়েছি অনেক। এবার ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। তাই দিচ্ছি বিরুবাবু। আসমানির চরে আমি গাছ লাগাই, পশুপাখি পেলেপুষে রাখি। চারদিকে জঙ্গল কমে যাচ্ছে, ওরা তাড়া খেয়ে খেয়ে এখানেই এসে জোটে। ওদের তো দলিল-টলিল নেই, কোথায় যাবে বলো তো!"

বীরবাহু চুপ করে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি হেরে গিয়েছেন বটে, কিন্তু খুব একটা গ্লানি বোধ হচ্ছে না তো!

গোকুলেশ্বর শান্ত গলায় বলল, "তোমার বন্ধুদের নিয়ে যাও বিরুবাবু। কিন্তু তোমার কুকুরদুটির বড়লোকের গুপ্তধন পাহারা দেওয়ার চেয়ে অনেক ভাল কাজ আছে। তারা আসমানির চরের পশুপাখিদের পাহারা দেবে।"

এবার বীরবাহু স্খলিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওদের পোষ মানালে কী করে?"

"আমি মন্ত্রতন্ত্র জানি না বিরুবাবু, শুধু ভালবাসতে জানি। আমার বিশ্বাস পশুপাখি ভালবাসা টের পায়।"

একটু বাদে বীরবাহু আর তাঁর চার শিকারি বন্ধু নিঃশব্দে হেঁটে এসে নৌকোয় উঠলেন। কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ যেন সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে।

॥ ৭ ॥

"মেজবাবুর আজ হল কী? ফিকফিক করে মাঝে-মাঝেই হেসে ফেলছেন যে বড়!"

"তা অবশ্য ঠিক, আমাদের যখন তখন হাসতে নেই। আভিজাত্য বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। একটু গেরামভারী না হলে প্রজারা মানবে কেন? কিন্তু আজ হাসির একটা ভুড়ভুড়ি হচ্ছে পেটের ভিতর, বুঝলে! সেখান থেকেই হাসিটা অনেকটা ঢেঁকুরের মতো উঠে আসছে। ব্যাটাকে আটকানো যাচ্ছে না।"

"তা অবিশ্যি ঠিক, ঢেঁকুর আটকানো খুব শক্ত। কিন্তু আপনার গোটাগুটি শরীরটাই তো বায়ুভূত, অর্থাৎ আপনি নিজেই তো একটা ঢেঁকুর ছাড়া কিছু নন। তা হলে ঢেঁকুরের আবার ঢেঁকুর হয় কী করে?"

"কথাটা মিথ্যে নয়। তবে সব কি আর নিয়ম মেনে ঘটে? মাঝে-মাঝে সব হিসেব উলটেপালটেও যায়। আহা, আমি কথা কইছি আর সেই ফাঁকে তুমি মন্ত্রীটাকে ওরকম বেমক্কা ঠেলে দিলে কেন? আমার নৌকোটা মারা পড়বে যে!"

"আপনার নৌকোটা না মারলে যে পরের চালে কিস্তি পড়ে যাবে মেজবাবু!"

"তাতে কী, কিস্তি পড়বে বলে কি সৌজন্য ভুলতে হবে নাকি? শ্রেষ্ঠের একটা সম্মানও তো আছে!"

"তা আছে। আপনার খাতিরে না হয় আমি মন্ত্রী সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু কিস্তি দিলে আপনার নৌকো যে ঘোড়ার পাল্লায় পড়ে যাবে, তা কিন্তু আগেই বলে রাখলাম। তখন আবার চেঁচামেচি জুড়বেন না যেন।"

"তোমার ঘোড়াটা অমন ছটফট করছেই বা কেন? সুস্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকুক না।"

"ঘোড়াই যদি লাফালাফি না করে তবে দাবা খেলার আর মজা কী?"

"তা লাফালাফি করুক না, বারণ করছে কে? শুধু আমার নৌকোর উপর চড়াও না হলেই হল। আরও তো কত ঘর ফাঁকা পড়ে আছে, দেখছ না? সেসব ঘরে গিয়ে লাফালাফি করতে দোষ কী?"

"খেলার তো একটা প্রথাও আছে মেজবাবু, আপনি আমার প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষকে সুবিধে করে দেওয়াটা তো প্রথার মধ্যে পড়ে না।"

"আমার তো মনে হচ্ছে, তুমি বেকায়দায় পড়েছ বলেই নৌকোটা মারতে চাইছ এবং সেটাও অন্যায়ভাবে। ঠিক কি না কুঁড়োরাম?"

"যুদ্ধের তো একটা নিয়ম আছে মেজবাবু, সেখানে অন্যায় বলে কিছু নেই।"

"কিন্তু আমি কথা কইছিলাম, সেটা ভুলো না। আর কথা কওয়ার সময়টা যুদ্ধবিরতি বলেই ধরা হয়।"

"আপনি তো সব সময়ে কথা কইতে-কইতেই খেলেন, তা হলে তো গোটা খেলাটাই যুদ্ধবিরতি বলে ধরতে হয়।"

"কথারও হেরফের আছে হে! আমি একটা গুরুতর কথায় ব্যস্ত ছিলাম।"

"গুরুতর? ঢেঁকুর নিয়ে কি খুব গুরুতর কথা হয় মেজবাবু?"

"এ তো আর যার-তার ঢেঁকুর নয় হে!"

"তা অবিশ্যি ঠিক! তালেবর লোকদের ঢেঁকুরও তুচ্ছ করার মতো নয়! তা ঢেঁকুর নিয়ে কি আপনার আর কিছু বলার আছে? তা হলে এইবেলা বলে ফেলুন!"

"ঠিক ঢেঁকুর নয়, আসল ব্যাপারটা ঢেঁকুরের পিছনে ঘাপটি মেরে আছে। আচ্ছা, এই যে তুমি রোজই দাবায় আমার কাছে লেজেগোবরে হয়ে হারো, তাতে তোমার আনন্দ হয় না?"

"সত্যি কথা বলতে কী মেজবাবু, আমাকে হারতে হয় বলেই হারি। তা তাতে আগে আনন্দও হত বটে, তবে এখন একটু গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।"

"হেরে আনন্দ পেতে শেখো কুঁড়োরাম। দেখবে হেরেও মাঝে-মাঝে এমন আনন্দ হবে যে, ঠেলা সামলাতে পারবে না। এই আমার যেমন হচ্ছে। ওহ, সে কী আনন্দ তা আর কী বলব! বেজায় আনন্দ হে। আর ওই আনন্দের চোটে আমার পেটে তখন থেকে এমন ভুড়ভুড়ি কাটছে যে, আভিজাত্য ভুলে আমি ফিকফিক করে হেসে ফেলছি।"

"বলেন কী মেজবাবু, আপনি হেরেছেন! এমন তাজ্জব কথা জীবনে শুনিনি! তা হারলেন কীসে? আর কোন বাপের ব্যাটার কাছে?"

"আহা, সেসব কথা বরং থাক। মোট কথাটা হল, হেরেও যে আনন্দ হয় এটা আমার জানাই ছিল না। তাই বলছি হেরে আনন্দ পেতে শেখো কুঁড়োরাম, ওতে ভারী সুখ।"

"তা হলে আপনার নৌকোটা মেরেই দিই মেজবাবু। আর দু'চালের মধ্যেই আপনি মাত হয়ে যাবেন। হারার আনন্দ থেকে আপনাকে আজ আর বঞ্চিত করতে চাই না।"

"আরে না, অত হুড়োহুড়ি করে চাল দিতে নেই। দাবা হল কূটবুদ্ধির খেলা, বুঝলে? ভাবো কুঁড়োরাম, অগ্রপশ্চাৎ ভাল করে ভেবে তবে চাল দিতে হয়।"

"বুঝেছি, খেলাটা আজ আর জমবে না মেজবাবু, আনন্দের ঠেলায় আপনি আজ বেজায় উলটোপালটা চাল দিয়ে যাচ্ছেন।"

"বলো কী হে! আমার চালে যেদিন ভুল হবে, সেদিন তো সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠার কথা। কিন্তু আমি যত দূর জানি সূর্য আজ পুব দিকেই উঠেছে।"

"না, ঠিক ভুল চাল নয়, তবে বড্ড বেশি উচ্চাঙ্গের চাল।"

"তাই বলো। কথাটা ঠিক। দাবায় আমার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো লোক এখনও জন্মায়নি। তাই তোমার মতো আনাড়ির সঙ্গেই খেলতে হয়।"